

একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাহিনী

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান



মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

jP

পুনঃমুদ্রণ
মার্চ ২০১৪

প্রকাশক
জয় প্রকাশন
৩৮/২-খ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

অক্ষরবিন্যাস
কমপিউটার ল্যান্ড
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মূল্য
১২০.০০ টাকা

ISBN 984-70154-0017-0

আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা
(আনুমানিক ৪০/৪২ বছর বয়সে)
১৩৫০ সালের ১০ই ফালগুন
(ইং-১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি)
অকালপ্রয়াত
মোহাম্মদ আব্দুল কাদের স্মরণে—

—হাবীবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত



১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাকহানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের হাতে শহীদ অগণিত বুদ্ধিজীবীর লাশের একাংশ।



গ্রন্থকারের কথা

একাত্তরের ভয়াল মধ্যরাত্রী। ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এক বর্বরোচিত মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন ছিল ১৯৭১ সালের নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রী। তারিখটা ২৫শে মার্চের দিবাগত নিশীথ। সমগ্র ঢাকা শহরবাসী গভীরঘুমে অচেতন। এমনি মুহূর্তে পাক-হানাদার বাহিনীর নির্মম হস্তে গর্জে উঠেছিল মেশিনগান—রাইফেল-মর্টার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার ঘুমন্ত শিক্ষক-ছাত্ররা সেই বিকট শব্দে জাগরিত হলেন। হানাদার পশুরা প্রবেশ করল আবাসিক হলে। শিক্ষক-ছাত্রদেরকে কক্ষ থেকে টেনে বের করল। তারপর গুলী করে হত্যা করা হয়। সেই রাত্রীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী জ্ঞানী-গূণী শিক্ষকবর্গ এবং জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজ যারাই পাক বাহিনীর কবলে পতিত হয়েছেন, কেউই রেহাই পাননি। হয়েছেন নির্মম অকাল মৃত্যুর শিকার একেবারেই বিনা অপরাধে। সেই বুদ্ধিজীবী হত্যা কাহিনী বিবৃত হয়েছে এ-গ্রন্থে। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সঠিক তথ্য আহরণে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয়নি। আশা করি, এ-গ্রন্থ থেকে পাঠক সেই ভয়াল রাত্রীর বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানতে সক্ষম হবেন।

তারিখ ঃ ১৬/৭/২০০৪ ইং
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

সূচিপত্র

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাম ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান।

পিতার নাম ঃ মৌলভী আহমদ আলী।

মাতার নাম ঃ মোসাম্মৎ হাকিমুন নেসা।

জন্মস্থান ঃ লেবুজিলবুনিয়া গ্রাম। থানা—নাজিরপুর; জেলা ঃ পিরোজপুর।

বর্তমান বাসস্থান ঃ রাজবাড়ী। থানা— নেছারাবাদ, জেলা ঃ পিরোজপুর।

জন্ম তারিখ ঃ ১/১১/১৯৪১ ইং (সার্টিফিকেট অনুসারে)।

প্রথম কবিতা প্রকাশ (পত্রিকায়) ঃ ১৯৫০ সালে। কবিতার নাম— 'জন্মভূমি'। পত্রিকার নাম— 'সেবা' (পুতন্তীপাড়া, ফরিদপুর)।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ ঃ ১৯৫৭ সালে। প্রকাশক—কোরান মঞ্জিল, বরিশাল।

গ্রন্থের নাম—'ছুটির দিনে' (শিশু নাটিকা)।

প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ঃ ৩০। (উপন্যাস, নাটিকা, ঐতিহাসিক বিষয়, জীবন চরিত, সাহিত্য-আলোচনা, কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি।)

অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ঃ ৫৬ (উপন্যাস, শিশু সাহিত্য, জীবন চরিত্র, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, কাব্যগ্রন্থ, ঐতিহাসিক বিষয়, শিশু সাহিত্য)।

যে সকল পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন এবং লিখছেন ঃ সেবা (ফরিদপুর); নওরোজ (দিনাজপুর); পিরোজপুর দর্পন, দীপ্তি, সাপ্তাহিক পিরোজপুর মুক্তবার্তা (পিরোজপুর); কিশোর সাহিত্য, রঙধনু, আলাপনী, নবারুন, বই, গণশিক্ষা, মনোরমা, অনুক্ত, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, বিচ্ছুরণ, পরওয়ানা (ঢাকা); অনন্তবিজয় (খুলনা); মারজান (সিলেট); আততাওহীদ, মুঈনুল ইসলাম (চট্টগ্রাম); তাবলীগ, কুঁড়িমুকুল (ছারছিনা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর)।

সংবাদপত্রে চিঠিপত্র-ফিচার-সাহিত্য পাতায় লিখেছেন ঃ দৈনিক সংবাদ, দৈনিক আজকের কাগজ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক নব অভিযান, দৈনিক শক্তি (ঢাকা)।

সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ ঃ নবারুন, নতুনমুখ, কালান্তর। কালান্তর এখনও নিয়মিত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়।

সংবর্ধনা ও পুরস্কার ঃ দর্পণ সাহিত্য পুরস্কার (পিরোজপুর); গ্রন্থ সূহৃদ সমিতির সংবর্ধনা (পিরোজপুর); বাংলাদেশ লেখক আইনজীবী সংসদ ও ঢাকাস্থ স্বরূপকাঠী যুব সমিতির সংবর্ধনা এবং জনকল্যাণ সংঘ, সবুজ বাংলা যুব সংঘ, স্বরূপ সাহিত্যবলয় এবং কুঁড়িমুকুল সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংবর্ধনা ও পুরস্কার।

গ্রন্থকারের কতিপয় অপ্রকাশিত গ্রন্থ

উপন্যাস
কথা দিলাম
জীবনের খস্ড়া
একজন ফজলের মা
রমনী ঃ জননী-জায়া
একটি থার্ডক্লাশ মৃত্যু
জীবনে যতটুকু চেয়েছি
কামনা-বাসনা
প্রেমের ফাঁদে

নাটক
দিল্লী অধিকার (ঐতিহাসিক)
জনসেবার লগ্নী কারবার (সামাজিক)
গাধার আত্মকথা (সামাজিক০
গরীবুল্লাহ মাস্টার

শিশু নাটিকা
রাজার জন্য নাসিকা
হবু রাজার গোবু মন্ত্রী
মডেল ইসকুল
কটাক্ষ
ত্রিরঙ্গম্

সাহিত্যালোচনা
সাম্যবাদী কবি নজরুল
একজন তসলিমা নাসরিন

প্রবন্ধ
সাহিত্য কথা
বিবিধ ভাবনা
প্রসঙ্গ ঃ নারীবাদ

রম্যরচনা
অর্থ চতুস্পদ কথা
ইবলিসের সঙ্গে কিছুক্ষণ
স্পেশালটক উইথ ইবলিস
আদম আলী উপাখ্যান

ঐতিহাসিক
রাক্ষসীপলাশী এবং অন্যান্য

শিশু-কিশোর সাহিত্য
হবু চন্দ্রের কিসসা
কল্পকথার গল্প

কাব্য গ্রন্থ
মিষ্টি কথার বৃষ্টি
শ্লোগান চলবেই

প্রসঙ্গ কথা

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন। দীর্ঘ এক যুগ পরে আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত নাগরিক অধিকার। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এই নির্বাচন ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন জেনারেল, সামরিক প্রশাসক। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে একটি মাত্র আসন ব্যতিরেকে অন্যান্য সবগুলোতে জয়লাভ করে। জাতীয় পরিষদেও সংখ্যাগরীষ্ঠতা থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্‌স্‌ পার্টি থাকে দ্বিতীয় স্থানে, তাও স্বল্পসংখ্যক আসন পেয়ে।

নির্বাচনের পর তিনমাসের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার প্রক্রিয়া শুরু হবার কথা। কিন্তু তা হচ্ছিল না। কেননা, নির্বাচনে বিজয়ী হলেও, ক্ষমতাসীন উর্দুভাষীরা বাঙালির কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণে আগ্রহী ছিল না। তাছাড়া পিপল্‌স্‌ পার্টির শীর্ষনেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন একেবারেই অনমনীয়। অথচ ভোটের রায় অনুসারে সরকার গঠনের কোনো এক্তিয়ার তার ছিল না। শুরু পূর্ব-পশ্চিমের তথা বাংলাভাষী-উর্দুভাষীর কোন্দল। ৭ই মার্চ '৭১ তারিখে আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক জনসভা। সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন অসহযোগ। তিনি বলেন ঃ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি আরও বলেন ঃ 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যেই স্বৈরাচারী পাক-সরকার বাংলাভাষীদের উপর দমন নীতি চালু করে দিয়েছিল।

বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেল নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছু অচল হয়ে পড়ল। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো, ওয়ালী খান এবং কতিপয় পশ্চিমা নেতা তার সংগে ছিলেন। সমঝোতার জন্য বৈঠক চললো শেখ মুজিবের সংগে। বৈঠক চললো বেশকিছুদিন ধরে। কিন্তু কোনো সমঝোতা হলো না। আসলে এটা ছিল প্রতারণা। বৈঠক চলাকালীন সময়ের মধ্যে পাক-সরকার তড়িঘড়ি করে সব আঁট-ঘাট বন্ধ করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলো সুকৌশলে। পূর্বাঞ্চলে যত বাঙালি সেনা কর্মরত ছিল, তাদেরকে এই অবসরে পশ্চিম

পাকিস্তানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। আর, পশ্চিমা সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলো পুর্বাঞ্চলে। সেই সংগে এখানে আমদানী হতে থাকলো ভারী এবং আধুনিক সমরাস্ত্র। এ ভাবে ভাওতাবাজিতে সময় অতিবাহিত হতে থাকলো। পশ্চিমা নেতারা একে একে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে থাকলেন। ইয়াহিয়া খানও চলে গেলেন ২৫শে মার্চ তারিখে। বলে গেলেন— ফিরে গিয়ে বেতারের মাধ্যমে তিনি তার বক্তব্য পেশ করবেন। হ্যাঁ, তিনি ফিরে গিয়েই তার ভাষণে জানিয়ে দিলেন— ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া আপাততঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। আর, জারী করা হলো মার্শাল ল'।

পূর্ব পাকিস্তানে নেমে এলো সেই দুর্যোগময় রাত। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র ঘুমন্ত নগরবাসীর উপর। রাজারবাগের পুলিশ ফাঁড়ি এবং পীলখানার ইপিআর (বর্তমান বিডিআর) ক্যাম্প দখল ক'রে নিলো সে-রাতেই। বহু বাঙালি পুলিশ-ইপিআর নিহত-আহত-বন্দী হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল সে-রাতেই আক্রান্ত হলো। সেখানে বহু অধ্যাপক, কর্মচারী এবং ছাত্রদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। সে-রাতেই শেখ মুজিবকে বন্দী করা হয়। পরে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটক রাখে। অনতিবিলম্বে জেনারেল টিক্কা খান আসেন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে। বেপরোয়াভাবে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন নির্যাতন এবং ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকলো।

তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান তার পাল্টুন নিয়ে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। এদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরাবার পূর্বেই অপারেশন শুরু হয়ে গেল। মেজর জিয়া ২৬শে মার্চ শেখ মুজিবের বরাত দিয়ে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়ে তার প্লাটুন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন। নির্বাচিত নেতারা, হিন্দুরা, এবং অন্যান্যা অনেকেই প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হলো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। পরে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নাম দিয়ে রাজধানী ঘোষণা করা হলো। গড়ে উঠলো মুক্তিবাহিনী। এ-বাহিনীতে সাধারণ বেসামরিক লোকজনই ছিল অধিক। অল্প কিছু বাঙালি সেনা (যারা তখন বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন বিভিন্ন সূত্রে) মুক্তিযোদ্ধা হন। বাংলাদেশকে এগারোটি সেকটরে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি সেকটরে তাদের মধ্য থেকে সেকটর কমান্ডার নিয়োগ করা হলো। অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসার কর্নেল ওসমানী (আতাউল গণি) হলেন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

সুদীর্ঘ নয় মাস চলেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের চেয়ে লুঠতরাজ, ধ্বংসলীলাই ছিল অধিক। মৃত্যুবরণ করেছে ত্রিশ লক্ষ মানুষ। তাদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল বেসামরিক জনগণ। বর্বর পাকসেনা এবং তাদের দোসর রাজাকার-আল্‌বদর-আস্‌শাম্‌স বেপরোয়া গণহত্যা চালিয়ে গেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে হয়েছে মৃত্যুর শিকার। ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পরিস্থিতি উদ্ভব হবার পরেও বর্বর পাক বাহিনী বেছে বেছে হত্যা করেছে এদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে। পরাজয় অবধার্য জেনেও তারা কেন এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল? সম্ভবতঃ পাক সরকারের যখন এ-দেশের আশা ছাড়তেই হবে, তখন দেশটাকে বুদ্ধিজীবীশূন্য দেশে পরিণত করবার খেয়াল চেপেছিল। তাই আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিয়েও বুদ্ধিজীবী হত্যার এ-কার্যক্রম তারা চালিয়েছিল। অতঃপর ১৬ই ডিসেম্বর বর্বর পাক বাহিনী প্রধান জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলো, স্বাধীন হলো। যুদ্ধে-অপঘাতে আমরা হারালাম ত্রিশলক্ষ তাজা প্রাণ এবং দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত।

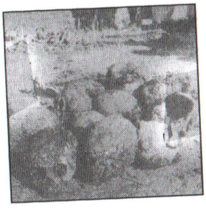
'৭১-এ পাক সরকারের প্রধান শত্রু ছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সমর্থকরা। তারপর হিন্দু এবং সর্বশেষে বাঙালি মাত্রেই তাদের শত্রু বলে বিবেচিত হতো। দেখা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকসেনারা অপারেশনে এসে আওয়ামী লীগ এবং মালাউন (হিন্দু) খোঁজ করেছে। ভেবেছে, এরাই মুক্তিযোদ্ধা। তাই তাদের জিগীর ছিল ঃ 'মুক্তি কাঁহা হ্যায়, মালাউন কাঁহা হ্যায়।' আবার এ-ও দেখা গেছে যে, দল-মতের ধার না ধরেও তারা বাঙালি পেলেই হত্যা করেছে। তারা হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে দখলে রাখতে চেয়েছে। কেননা, সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা বাংলার সম্পদই ছিল তাদের প্রাচুর্যের উৎস। তাছাড়া এ-অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা, অর্থনীতি আগেই তাদের কব্‌জায় গিয়েছিল। তাই বাংলাদেশটা তাদের থাকলেই হলো। এদেশের মানুষকে তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাই নির্বিচারে বুদ্ধিজীবী হত্যা, বাঙালি হত্যা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তারা বিবেক-বুদ্ধি-মানবতা বিসর্জন দিয়ে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছিল।

প্রথমেই তাদের টার্গেটে ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা এবং হিন্দুরা। এ-কারণেই প্রথম আক্রমণের স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল। এখানেই অধিকাংশ হিন্দু অধ্যাপক এবং হিন্দু ছাত্রদের বসবাস ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এবং তার এলাকাধীন অঞ্চলে '৭১-এর ২৬শে মার্চ ঘটে গেছে সর্বাধিক নির্মম

গণহত্যা। এখানে অধ্যাপক, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারভুক্ত সদস্যরা অনেকেই বর্বর পাক বাহিনী নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে নিহত হয়েছেন। নিহত হয়েছে হলের ছাত্র এবং অতিথিরা। সম্ভবতঃ সকল নিহতের নাম-ঠিকানাও জানা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিষ্ঠুরতম গণহত্যায় একইস্থানে সর্বাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, যারা ছিলেন জাতির বিবেক শিক্ষক এবং জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার যারা হতে পারতেন সেই ছাত্ররা। বর্বর পাকবাহিনী প্রথমেই সেই মোক্ষম স্থানকেই টার্গেট করেছিল। তার পরেও বেছে বেছে বুদ্ধিজীবী হত্যা করেও তাদের শেষ রক্ষা হয় নি। বাঙালির রক্তস্রোতে ভেসে গেছে তাদের শক্তির অহংকার।

বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং গণহত্যার সঠিক তথ্য, নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। কেননা, সেই ভয়ংকর দুর্যোগময় দিনে, ভয়াল রাত্রিতে কে কোথায় কীভাবে প্রাণ হারিয়েছেন, তা কারো পক্ষে সম্যক জানা সম্ভবপর ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরে সে-সব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন লোকের লেখা থেকে যেটুকু তথ্য আহরণ করা গেছে, তা-ই সম্বল করে এ-ইতিকাহিনী লেখা হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শিতার কোনো সুযোগ ছিল না। যদি কোন প্রত্যক্ষদর্শী এখনও বেঁচে থাকেন, তার কর্তব্য হচ্ছে তথ্যাবলী লিখে প্রচার করা। তাহলে আমাদের সঠিক ইতিহাস, পূর্ণাংগ ইতিহাস পাওয়া সম্ভব হবে। আমরা ইতিহাসের বিকৃতি কামনা করি না। আমরা চাইনা, যুগেযুগে ইতিহাসের রদবদল হোক।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ 'একাত্তরের বুদ্ধি হত্যা কাহিনী' হলেও '৭২ -এর প্রথম দিকের হত্যা কাহিনী যা একাত্তরের ধারাবাহিকতায় এসেছে, তা-ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। লিপিবদ্ধ হয়েছে ২৫ মার্চ রাতের পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও। সেই সংগে সাত বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং ২৫ মার্চ রাতে জগন্নাথ হলের নিহত ছাত্রদের কথাও লেখা হয়েছে। আশা করি, তা অপ্রাসংগীক বলে বিবেচিত হবে না।





ড. গোবিন্দ চন্দ্রদেব

ড. গোবিন্দ চন্দ্রদেব বৃহত্তর সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার লাউতা গ্রামের সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন। দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুকাল। সর্বশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। '৭১-এ তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ড. ডি. সি. দেব 'আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় কয়েকবার ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে গিয়েছেন। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানে তার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Dev Foundation (দেব ফাউন্ডেশন)। তৎকালীন All Pakistan Philosopical congress (অল পাকিস্তান ফিলসোফিকাল কংগ্রেস)-এর সম্পাদক ছিলেন। তার দর্শন বিষয়ক মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো হলো ঃ

১। Aspiration of the common Men.

২। Budhist the Humanist.

৩। Problem of the East.

৪। Idealism and Progress.

৫। The Philosophy of Vivekananda.

৬। আমার জীবন-দর্শন

৭। তত্ত্ববিদ্যাসার

তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Pali and Sanskrit Board. তিনি ছিলেন তার সভাপতি।

নিবেদিত প্রাণ দার্শনিক অধ্যাপক জি. সি. দেব ছিলেন চিরকুমার। তিনি বলতেন ঃ 'দর্শন আমার জীবন, দর্শন আমার সহধর্মিনী, দর্শন আমার পুত্রকন্যা, এক কথায় দর্শনই আমার জীবনের চাবিকাঠী, মানবতাই আমার আরাধ্য।' তবুও তার একটি সংসার ছিল। মেয়ে-জামাই-নাতনী নিয়ে সেই সংসার। তার মেয়েটি পালিতা কন্যা। তার নাম বেগম রোকেয়া সুলতানা। শিশু নাতনীটির নাম রাবেয়া। জামাইয়ের নাম মোহাম্মদ আলী। বলা বাহুল্য, তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু

হলেও, তার পরিবারের সদস্যরা মুসলমান। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, যা প্রায় কল্পনাতীত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ২৫শে মার্চের গভীর রাতে আক্রান্ত হলেও, ড. জি. সি. দেব এবং জামাতাকে হত্যা করা হয় ২৬শে মার্চ সকাল বেলা। ড. দেবের তখন উপাসনায় বসার সময়। তিনি তার মেয়েকে বললেন উপাসনার স্থান করে দিতে। এমনি সময়ে তার বাসার দ্বারপ্রান্তে হানাদার বাহিনী এসে উপস্থিত হলো। তারা আদেশ করলো দরোজা খোলার। তার জামাতা দরোজা খুলে দিতেই তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়। অতঃপর বৃদ্ধ এবং অসুস্থ জি. সি. দেবকে গুলী করে হত্যা করলো। তার কক্ষটিতে প্রবাহিত হলো হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তস্রোত। শুধু হত্যা করেই বর্বর সেনারা ক্ষান্ত হয়নি। সেই মৃতদেহ বেয়নেট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে, লাথী মেরেছে। তারপর সরিয়ে নিয়ে গেছে মৃতদেহ। সৎকার করবারও সুযোগ দেয়নি সেই নরপশুরা।



২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় মিরপুরে হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের হাতে শহীদ মুক্তিকামী মানুষের উদ্ধারকৃত মাথার খুলি ও হাড়গোড়।



ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯২০ সালে ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জেলার বানারীপাড়ায়। তিনি পড়াশুনা করেছেন ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মেট্রিক-আই. এ-তে প্রথম বিভাগ, বি.এ. (ইংরেজি) অনার্সে প্রথম শ্রেণী এবং এম. এ-তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করতেন।

২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন তিনি এম. এ. প্রিলিমিনারী এবং অনার্স পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। পাক-আর্মি মেজর ড. গুহঠাকুরতার কক্ষে প্রবেশ করে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আপ প্রফেসর সাহাব হ্যায়?' তিনি উত্তরে ইংরেজিতে yes বলার পর মেজর বললো ঃ 'আপকো লে যায়েগা।' তারপর তাকে টেনে-হিঁচড়ে কক্ষের বাইরে নিয়ে গেল। তার স্ত্রী বাসন্তীরানী গুহঠাকুরতা এবং মেয়ে মেঘনা গুহঠাকুরতা কিছুক্ষণ পরে তাকে গুলীবৃদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন জীবিত ছিলেন। তাকে কক্ষে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো। তখনও তিনি জ্ঞান হারাননি। তবে রক্তপাতের কারণে মুমুর্ষূ অবস্থায় ছিলেন। সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকার কারণে যথাসময়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো যায় নি।

২৭শে মার্চ ড. গুহঠাকুরতাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে তখন কোনো ডাক্তার ছিল না। দায়িত্বরত নার্সরা যেটুকু সম্ভব সেবা-যত্ন করেছে। এখানে ৩০শে মার্চ বিনা চিকিৎসায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন পাকসেনারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে রাখার ফলে তার লাশ সৎকারের জন্য সরিয়ে নেওয়া যায় নি। অতঃপর তার মৃতদেহের অবস্থা কী হয়েছে, তা জানবার সাধ্য কারও হয়নি।

ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা যেমন ছিলেন একজন দক্ষ অধ্যাপক তেমনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সংগেও সম্পৃক্ত ছিলেন না। বর্বর পাক-বাহিনীর হিংস্রথাবায় একটি অমূল্য জীবন অকালে ঝরে গেল।

আ.ন.ম. মুনিরুজ্জামান

আ.ন.ম. মুনিরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রধান পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

আ.ন.ম. জামান ১৯২৪ সালে যশোর জেলার কাঁচেরকল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি নড়াইল হাইস্কুল থেকে চারটি লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৪২ সালে আই.এস.সি. পাশ করেন ডিস্টিংশনসহ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। গণিতে অনার্সসহ বি.এস.সি পাশের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি পাস করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল।

আ.ন.ম. জামান এক বছর কলিকাতায় চাকুরি করার পর ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৮-এ পরিসংখ্যান বিভাগে এসে ১৯৬১ সালে এসোসিয়েটেড প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং ১৯৬৭ সালে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপনায় তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগটি চালু করা হয়।

একাত্তরের ২৫শে মার্চের ভয়াল রাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে রক্ষা পাননি নির্বিরোধ ধর্মপ্রাণ অধ্যাপক আ.ন.ম. জামান। জল্লাদ বাহিনী যখন তার বাসায় আক্রমণ চালায় তখন তিনি জায়নামাজে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। পাক সেনারা তার ঘরের দরোজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে তাকে জায়নামাজ থেকে বাইরে টেনে এনে গুলী করে। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শুধু তিনি একা নন। তার সংগে তার ছোটভাই শামসুজ্জামান (বয়স ২৬ বছর, পেশায় উকিল), তার বড় ছেলে আকরামুজ্জামান (বয়স ১৬ বছর, মেট্রিক পরীক্ষার্থী), এবং তার বোনের ছেলে মঞ্জু (বয়স ১৪ বছর, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র) অকালে হয়েছিল মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার। তার পরিবারে যারা সেদিন বেঁচে রইলেন, তারা হলেন তার স্ত্রী বেগম মাহমুদা জামান, মেয়ে নাজরিন বেগম (বয়স ১৪ বছর) এবং ছেলে মাসুদুজ্জামান (বয়স ১০ বছর)।

আ.ন.ম. মুনিরুজ্জামান রাজনীতি করতেন না। অধ্যাপনাই ছিল তার একমাত্র ব্রত। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ন, নীতিবান, অমায়িক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রিরা তাদের বিভাগে 'শহীদ মুনিরুজ্জামান সেমিনার' নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।



অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী যেমন খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন তেমনি ছিলেন সফল নাট্যকার। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েও তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। অতঃপর '৭১-এর দখলদার পাক বাহিনী যখন বাংলাদেশে ধ্বংস এবং গণহত্যার তাণ্ডব লীলায় উন্মত্ত, তখনও অপঘাতে মৃত্যুবরণ করে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থায়ী আসনে সমাসীন হয়েছেন। তার এ আসন কোনোদিনই টলবে না।

মুনীর চৌধুরীর পিতা খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী ছিলেন নোয়াখালীর বাসিন্দা। তিনি তখন মানিকগঞ্জ মহকুমা (এখন জেলা) প্রশাসক (এস. ডি. ও) হিসেবে মহকুমা শহরে অবস্থান করছিলেন। এখানে ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর মুনীর চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। আই এস-সি পড়েন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৩ সালে তিনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে অনার্স এবং ১৯৪৭ সালে তিনি এম.এ. ডিগ্রীলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বামপন্থী রাজনীতির সংগে সম্পৃক্ত হন। কিছুকাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার পর ১৯৪৯ সালে তিনি খুলনা (দৌলতপুর) বি. এল. কলেজে ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে চাকুরি নেন। এসময়ে রাজনৈতিক কারণে তাকে আটক করা হয়। তারপর রাজনীতি না-করার মুচলেকা লিখে দিয়ে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দেন। কিছু দিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। আড়াই বছর কারারুদ্ধ ছিলেন।

কারাবন্দী থাকাকালে তিনি বাঙ্‌লায় এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কারামুক্ত হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে কর্মরত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি বাঙলা বিভাগের অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষকতা পেশায় যেমন তিনি স্বনামধন্য, নাট্য রচনাতেও তিনি তেমনি খ্যাতিমান। তার রচিত নাটক ঃ

১। রক্তাক্ত প্রান্তর (প্রকাশকাল—১৯৬২)

২। কবর (তিনটি একাংকিকা সংকলন, যথা— মানুষ, নষ্ট ছেলে, কবর)। —প্রকাশকাল—১৯৬৬।

৩। চিঠি (প্রকাশকাল—১৯৬৬।)

৪। দণ্ডকারণ্য (একাংকিকা সংকলন। প্রকাশকাল—১৯৬৬)।

৫। পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (একাংকিকা সংকলন। প্রকাশকাল—১৯৬৭)।

৬। কেউ কিছু বলতে পারে না (বার্নার্ড শ-এর you never can tell নাটকের বাঙ্‌লা রূপান্তর। প্রকাশকাল—১৯৬৭)।

৭। মূখরা রমণী বশীকরণ (শেকসপীয়ার-এর নাটকের বাঙ্‌লা রূপান্তর। প্রকাশকাল—১৯৬৯)।

৮। রূপার কোটা (গল্‌স্‌ওয়ার্দীর The silver box-এর বাঙ্‌লা রূপান্তর। প্রকাশকাল—১৯৭০)।

৯। ওথেলো (সেক্‌স্‌পিয়ারের বিখ্যাত 'ওথেলো' নাটকের বাঙ্‌লা রূপান্তর। এটি অসমাপ্ত)।

তার রচিত একাংকিকার সংখ্যা—২২।

'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে তিনি বাঙ্‌লা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। সে-কারণে এটিকে তার শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে।

মুনীর চৌধুরী শুধুই নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তার রচিত সাহিত্য সমালোচনা এবং মৌলিক প্রবন্ধাদি বিদগ্ধমহলে প্রশংসিত। এ-বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থাবলীঃ

১। ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় (প্রকাশকাল—১৯৬৩)।

২। মীর মানস (প্রকাশকাল—১৯৬৫)।

৩। তুলনামূলক সমালোচনা (প্রকাশকাল—১৯৬৯)।

৪। বাংলা গদ্যরীতি (প্রকাশকাল—১৯৭০)।

৫। বৈদেশী (প্রকাশকাল—১৯৭৮)।

'মীর মানস' গ্রন্থের জন্য তিনি দাউদ পুরস্কার লাভ করেন। তার অপ্রকাশিত রচনা ঃ

১। গুর্গন খাঁর হীরা (প্রহসন)।

২। জমা খরচ ও ইজা (একাংকিকা)।

৩। মহারাজ (নাটক)।

৪। গল্প সংকলন (পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের সংকলন)।

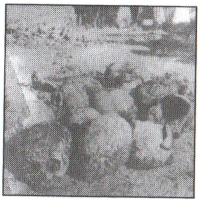
তার আরেকটি কৃতিত্ব— নতুনভাবে বাঙ্‌লা মুদ্রাক্ষর লিপির (Type writing) উদ্ভাবন।

মুনীর চৌধুরীর মধ্যে ছিল বহু গুণের সমাহার। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান লেখক, নাট্যকার, নাট্যসংগঠক, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট বাগ্মী। সর্বক্ষেত্রেই তার অসামান্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। এতো কিছুর পরেও তিনি তার পেশা অধ্যাপনার ক্ষেত্রে ছিলেন নিষ্ঠাবান এবং সার্থক।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র ছিল মৃত্যুর বিভিষিকা। কে কোথায় কখন কীভাবে মৃত্যুর গহ্বরে চলে যায়, তা' কারোই জানা ছিল না। হানাদার পাক বাহিনীর সংগে বাঙালিরা করছিল মুক্তিযুদ্ধ। পাকসেনারা ছিল আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত। আর, মুক্তিবাহিনীর ছিল মাত্র সাধারণ রাইফেল। হানাদার বাহিনী যখন বাঙালি নিধনের অপারেশনে বেরুতো, মুক্তিযোদ্ধাদের তখন গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বলতে গেলে বিনা প্রতিরোধেই পাকসেনারা তাদের অপারেশন সাকসেসফুল করেছে। এ-ভাবেই নিহত হয়েছেন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, সাধারণ জনগণ। অবশেষে ডিসেম্বরের দশ তারিখের পরেই হানাদার বাহিনী বুঝতে পেরেছে যে, তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আত্মসর্পণ করা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ নির্দিষ্ট হলো। ইত্যবসরেও বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা বাস্তবায়নে পাক-বাহিনী কসুর করেনি।

১৪ই ডিসেম্বর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী পাকবাহিনীর দোসর আল্‌বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত হন। তারপর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ তিনি ঘাতক কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এ-সময়ে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ছেচল্লিশ বছর।





অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার খালিশপুর গ্রামে ১৯২৬ সালের ২২শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন এবং ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্লায় বি-এ. অনার্স ক্লাশে ভর্তি হন। পরে বিশ্বভারতীতে অধ্যায়ন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতী থেকে 'সাহিত্য ভারতী' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে বাঙ্লায় প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রথম ১৯৪৯ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে Script writer-এর চাকুরি নেন। ১৯৫০ সালে জগন্নাথ কলেজে বাঙ্লার লেকচারার হন। ১৯৫৫ সালে সিনিয়ার লেকচারার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি রিডার পদে উন্নীত হন।

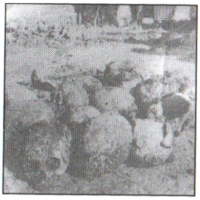
রবীন্দ্র সাহিত্য বোদ্ধা হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচক হিসেবেও তার সুনাম ছিল। প্রথমে তিনি কবিতা এবং ছোটগল্প লিখতেন। পরে তিনি গবেষণামূলক রচনা এবং প্রবন্ধ লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্মৃতিকথা মূলক রম্যরচনা এবং কয়েকটি বেতার নাটকও লিখেছেন। তার কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থের নাম ঃ

১। বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার
২। রবি পরিক্রমা
৩। সাহিত্যে নব রূপায়ন
৪। ভাষা ও সংস্কৃতি সমীক্ষা
৫। Coloquel Bengali (কলোকেয়েল বেঙ্গলী)
৬। রঙ্গিন আঁখর (এটা ব্যক্তিগত রচনা)

একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তার ছোটভাই লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাসায় ছিলেন। তখনও তার দুপুরের খাবার খাওয়া হয়নি। এমন সময়ে আল্‌বদর বাহিনীর লোকেরা এসে তাকে পাকড়াও করে। বলে তাদের সংগে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে তা-ও স্পষ্ট করে বলেনি। তখন দেড়টা বাজে। তিনি খাবার খেয়ে নিতে চাইলেন। নর পশুরা তাকে সে-অবসরও দেয়নি। তিনি তাদের সংগে অভূক্ত অবস্থায়ই যেতে বাধ্য হলেন। সেই যে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। তাকে কোথায় কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা আজও জানা যায় নি। এ-ভাবেই ঘটলো তার জীবনের নির্মম পরিসমাপ্তি।



১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাকহানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের হাতে শহীদ অগণিত বুদ্ধিজীবীর লাশের একাংশ।



আনোয়ার পাশা

আনোয়ার পাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ডব্‌কাই গ্রামে ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাইমাদ্রাসায় পাড়াশুনার পর কলেজে ভর্তি হন। বি. এ. পাশ করেন রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৫১ সালে। ১৯৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর নিজের এলাকায় একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি পেয়ে যান।

আনোয়ার পাশা ১৯৫৮ সালে জীবিকার সন্ধানে ওপার বাঙ্‌লা ছেড়ে এপার বাঙলায় চলে আসেন। তিনি পাবনায় এড্‌ওয়ার্ড কলেজে নিয়োগ পেয়ে যান। ১৯৬৫ সালে তিনি এ-দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা বিভাগে লেকচারার হন।

আনোয়ার পাশা সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, গবেষণাধর্মী রচনা লিখে সাহিত্যাংগনে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার লেখা 'নীড় সন্ধানী' উপন্যাসে তার নিজের জীবনের বাস্তবতা রূপায়িত হয়েছে। 'নীড় সন্ধানী' উপন্যাসে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের হিংসা, ঘৃণা, নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। তথাপি তিনি তার লেখাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলেছেন, যেটা ভারতে তখন অকল্পনীয়। চিন্তা-চেতনায় তিনি ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। তার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

১। নদী নিঃশেষিত হলে (কাব্য)
২। নীড় সন্ধানী (উপন্যাস)
৩। নিষুতিরাতের গাঁথা (উপন্যাস)
৪। নিরুপায় হরিনী (ছোটগল্প)
৫। সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল (আলোচনা)
৬। রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা (রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনা)

১ম ও ২য় খণ্ড : এ ছাড়া পত্র-পত্রিকায় তার বহু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি। মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের সংগে যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ঃ

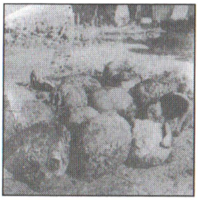
১। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য; ২। কালকেতু উপাখ্যান; ৩। মানসিংহ ভবানন্দ উপখ্যান; ৪। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ; ৫। চর্যাগীতিকা। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে ঃ

১। সমুদ্র-শঙ্খলতা-উজ্জয়িনী (কাব্য); ২। রাইফেল-রোটি-আওরাত (উপন্যাস); ৩। নেতিগর্ভ (উপন্যাস); ৪। হাজি সাহেবের বাড়ীর পথ (উপন্যাস)।

একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর কুখ্যাত আল্‌বদর বাহিনীর হাতে আনোয়ার পাশা ধৃত এবং নির্মমভাবে নিহত হন। এসময়ে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩ বছর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই মোহাজের বুদ্ধিজীবী নীড়ের সন্ধান পেলেন এ-দেশের কোনোও অনির্দিষ্ট স্থানে। ১৯৭২ সালে বাঙলা একাডেমী তাকে মরনোত্তর সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে।



২৫ মার্চ ১৯৭১ : ভয়াল কালো রাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠা বর্বর হানদার বাহিনী নিষ্পাপ ঘুমন্ত শিশু-কিশোরদেরও ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে।



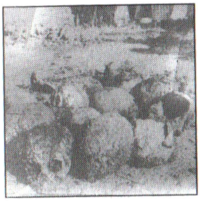
অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য

অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক। তিনি ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। আবার জগন্নাথ হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্বও ছিল তার।

২৫শে মার্চ শেষরাতে তাকে তার কক্ষ থেকে পাকসেনারা ধরে এনে বেদম প্রহার করে। তাকে হাত পিছনে নিয়ে ধূতি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তার পরনে ছিল শুধু আণ্ডার ওয়্যার। নির্যাতনের ফলে তিনি ছিলেন অপ্রকৃতিস্থ্। তাকে অ্যাসেম্ব্লী ভবনের সামনে উবু করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। অতঃপর পাকসেনারা তার মৃতদেহ অনেক লাশের সংগে জগন্নাথ হলের গণকবরে সমাহিত করে। এ-ভাবে চরম নিষ্ঠুরতার মধ্যদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময় তরুণ শিক্ষক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের জীবনাবসান ঘটে।



২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ : এদিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ছাত্রনেতা আসাদ



আতাউর রহমান খান খাদিম

আতাউর রহমান খান খাদিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৩ সনে তিনি পদার্থ বিদ্যায় বি. এস.-সি (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। পরে ইলেকট্রনিক্স্‌ এবং মাইক্রোওয়েভ বিষয়ে গবেষণা করে এম. এস-সি ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রথমে তিনি ফিলিপ্‌স্‌ ইলেকট্রিক কোম্পানীতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে চাকুরি নেন। দু'বছর চাকুরি করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পশ্চিম জার্মানী যান। দেশে ফিরে এসে ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় যোগদান করেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

আতাউর রহমান খান খাদিম ঢাকা হল এলাকায় তার কোয়ার্টারে একাত্তরের ২৬শে মার্চ সকাল বেলায় হানাদার পাকবাহিনী কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স চল্লিশের নীচে ছিল। তখনও তিনি ছিলেন অকৃতদার।

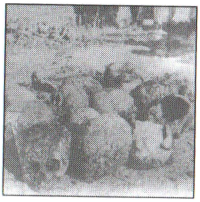


ড. ফজলুর রহমান খান

ড. ফজলুর রহমান খান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। থাকতেন ইকবাল হলের নিকটস্থ আবাসিক ভবনে। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে জগন্নাথ হলের মতোই এ-হলেও বর্বর পাকবাহিনী হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল। নিহত হন কয়েকজন অধ্যাপক এবং অসংখ্য ছাত্র। এই তাণ্ডবে ড. এফ. রহমানও নির্মমভাবে নিহত হন।

ডঃ এফ. রহমান বিয়ে করেছিলেন মৃত্যুর অল্প ক'বছর পূর্বে। তার স্ত্রী ফরিদা রহমান পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য বিলেতে অবস্থান করছিলেন। তার বিলেত গমনের পূর্বেই তাদের একমাত্র শিশু সন্তানটি মারা গিয়েছিল।

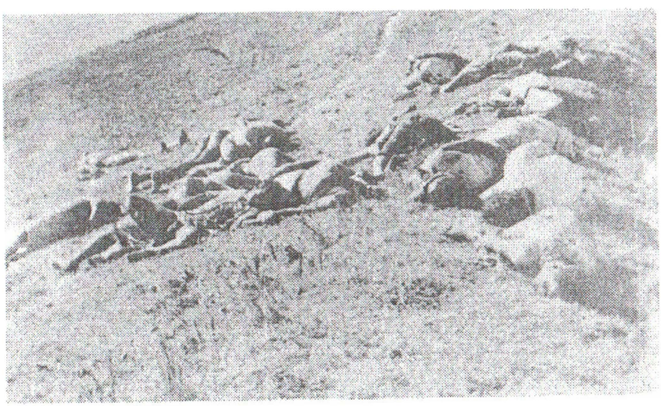
ডঃ এফ. রহমানও বিলেতে চলে যেতেন। তার স্ত্রী বিলেত থেকে টিকেট পাঠালেই তিনি চলে যাবেন। টিকেট পাওয়ার পূর্বেই এসে গেল তার মৃত্যুর পরওয়ানা। নরপশুরা তার আশাপূর্ণ করতে দিলো না। মৃত্যুকালে প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখদর্শন তার ভাগ্যে ছিল না।

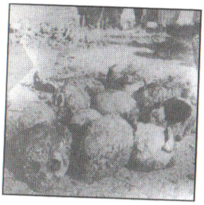


মুহাম্মদ আবদুল মুকতাদির

মুহাম্মদ আঃ মুকতাদির ১৯৪০ সালে সিলেট জেলার সিলাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত। তাই অর্থকষ্টের মধ্যদিয়ে তাকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৬২ সালে কৃতিত্বের সহিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থায় সহকারী ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে চাকুরি গ্রহণ করেন। অল্পকাল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ব বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। দু'বছর পর বৃত্তিনিয়ে বিলেত যান ভূ-তত্ব বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিপ্লোমা অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন।

মুহাম্মদ আঃ মুকতাদির ছিলেন সুদর্শন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং স্বল্পভাষী। অধ্যাপনার কাজেও তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে হানাদার পাক বাহিনীর গুলিতে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তরুণ শিক্ষক। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩১ বছর।





অধ্যাপক শরাফত আলী

অধ্যাপক শরাফত আলী কুমিল্লা জেলার দক্ষিণ রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাই তাকে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি. এস-সি পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। পাশের সংগে সংগেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের লেকচারার পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি শহীদুল্লাহ হলের হাউসটিউটরের দায়িত্ব পান।

অধ্যাপক শরাফত আলী পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। পরিবারের ভরণপোষণ এবং চারটি ভাই-বোনের লেখা-পড়ার খরচ তাকেই বহন করতে হতো। এ কারণে তিনি সর্বদাই আর্থিক অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করতেন।

২৬শে মার্চ সকালে পাক বাহিনী শহীদুল্লাহ হল আক্রমণ করে। অধ্যাপক শরাফত আলী বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন। পাকসেনারা তাকে সেখান থেকে ধরে এনে বেয়নেট চার্জ করে। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সপ্তাহাধিক কাল অন্যান্য লাশের সংগে তার লাশও ক্যাম্পাসে পড়ে থাকে। পৌরসভার দায়িত্বে গলিত লাশগুলো অপসারিত হয়। তাই তার লাশের নিয়মমাফিক সৎকার করাও সম্ভব হয়নি। এই তরুণ অধ্যাপক তখন পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন।



স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য শহীদানের সাথে জীবন বিসর্জন করেন সাপ্তাহিক 'শীলালিপি' সম্পাদিকা সেলিনা পারভীন।



মোহাম্মদ সাদেক

মোহাম্মদ সাদেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিটিউট অফ এডুকেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ পরিচালিত ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১নং বাড়ির নীচতলায় বাস করতেন।

একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পাক মিলিটারীদের হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্র, অধ্যাপক এবং কর্মচারী নিহত হন। মোহাম্মদ সাদেক তাদের মধ্যে একজন। মিলিটারীরা তার বাসগৃহের দরোজার কাছে এলে তিনি দরোজা খুলে দেন। প্রথমে তার হাতে গুলি করা হয়। তারপর গলায় বেয়নেট চার্জ করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। ২৭শে মার্চ কিছু সময়ের জন্য কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হলে তার ভাই আমিনুল হক অপর এক ব্যক্তির সহযোগিতায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাহিত করা হয়। ২৫শে মার্চের রাতে নিহিত অন্য কারো লাশ বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে সমাহিত করা যায় নি। চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে এটাই তার সৌভাগ্য। তার বিধবা স্ত্রী এবং চারটি অনাথ সন্তানের দায়িত্ব চাপে তার বেকার ভাই আমিনুল হকের ঘাড়ে।

ড. আবুল খয়ের

ড. আবুল খয়ের ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তিনি নির্ভীক, স্পষ্টভাষী এবং রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাক-বাহিনী একবার তাকে গ্রেফতার করেছিল। অবশ্য সেবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু দালাল শিক্ষক ছিলেন। তারা ড. খয়েরকে সুনজরে দেখতেন না। সম্ভবতঃ তাদের চক্রান্তেই তিনি একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর আল্‌বদর বাহিনী কর্তৃক ধৃত হন আরও কয়েকজন অধ্যাপকদের সংগে। তাদের সংগে তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে মীরপুরের এক ধানক্ষেতে পুঁতে রাখা হয়। পরে তাকেসহ আরো কয়েকজনের লাশ উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। এ-ভাবেই এই সাহসী অধ্যাপকের জীবনাবসান ঘটে।



রাশীদুল হাসান

রাশীদুল হাসান ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। আনোয়ার পাশার সংগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন একই সংগে পাবনার এড্ওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। একাত্তরের ২০শে সেপ্টেম্বর দখলদার পাক সেনারা তাকে ধরে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি কিছুটা ভীত হয়ে তার বন্ধু আনোয়ার পাশার বাসায় আশ্রয় নেন। কিন্তু তাতেও তিনি রেহাই পান নি।

১৪ই ডিসেম্বর সকালে আল্‌বদর বাহিনীর লোকেরা রাশীদুল হাসানকে ধরে নিয়ে যায়। সংগে আনোয়ার পাশাকেও ধরা হয়। পশ্চিম বঙ্গ থেকে দুই বন্ধু একই সময়ে এ-দেশে এসেছিলেন। আবার তাদের শেষ যাত্রাটাও একই সংগে হলো। সেই যে গেলেন আর তাদের নীড়ে ফেরা হলো না। এ-ভাবেই ঘটে তাদের মর্মান্তিক জীবনাবসান।

রাশীদুল হাসান সাহিত্যচর্চা করতেন। পত্র-পত্রিকায় তার বহু মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ হয় নি। বলা যায়, তার সংগে সংগেই তার সাহিত্যকৃতিও হারিয়ে গেল চিরতরে।





অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য

সন্তোষ ভট্টাচার্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় এসেছিলেন। তিনি ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক হওয়া স্বত্বেও ইংরেজি, বাঙলা এবং সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য যে এলাকায় বসবাস করতেন, সেখানে কতিপয় দালাল শিক্ষক থাকতেন। সে কারণে তার শেষরক্ষা হলো না। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৭১ সাল) সকালে তিনি আহ্নিকে বসেছিলেন। তার আহ্নিক ক্রিয়া আর সমাপ্ত হলো না। আল্‌বদরের লোকেরা এসে অনেকের সংগে তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে গেল। মীরপুরের বধ্যভূমিতে অনেকের সংগে তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। একটুর জন্য তাদের আর দেখা হয় নি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য। পরে অবশ্য তার লাশ উদ্ধার করে যথারীতি সৎকার করা হয়।



২৫ মার্চ ১৯৭১ : কালো রাতে বর্বর হানদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। শুরু করেছিল হত্যাযজ্ঞ। তারই শিকার সাধারণ মানুষ।



অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন গিয়াসুদ্দীন আহমেদ। মোহসিন হলের হাউস টিউটরের দায়িত্বও ছিল তার উপরে। পঁচিশে মার্চের হামলা থেকে শুরু করে সব সময়ে তিনি পাক-বাহিনী কর্তৃক অত্যাচারিত শিক্ষক পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন এবং সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

১৪ই ডিসেম্বর সকাল বেলা। গিয়াসুদ্দীন আহমেদ পানির পাম্প মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। কেননা, সেই সময়ে কোনো মিস্ত্রী পাওয়া যাচ্ছিল না। এমন সময়ে আল্‌বদর বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে। তারা অনেকের সংগে তাকেও ধরে নিয়ে যায়। তারপর মীরপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করে গণ কবর দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে গলিত লাশ উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। এ-ভাবেই একজন মানবদরদী পরহিতব্রতী ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।



ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৪০ জন নেতৃস্থানীয় নেতাকে মিথ্যা আলোচনার আশ্বাস দিয়ে ডেকে এনে এভাবেই নৃশংসভাবে হত্যা করে বর্বর বাহিনী।

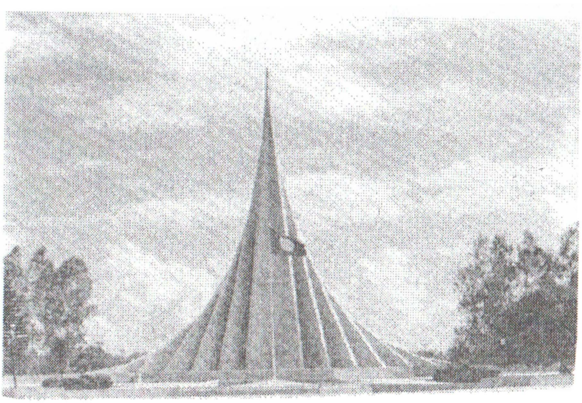


ড. আবুল কালাম আজাদ

ড. আবুল কালাম আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের যশস্বী অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য স্বর্ণপদক পান। অধ্যায়ন শেষে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনী একাডেমী অধ্যাপনায় যোগদান করেন। এই চাকুরি থাকাকালে প্রশিক্ষণের জন্য তিনি যুক্তরাজ্যে যান। চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই তাকে এখান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং একসময়ে জগন্নাথ কলেজে গণিত বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

ড. আবুল কালাম আজাদ দ্বিতীয়বার যুক্তরাজ্যে গিয়ে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। এ-ছাড়াও সেখান থেকে তিনি ডক্টরেট এবং ডিপ্লোমা পান। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনাও করেন। তার শেষ কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. আজাদ ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৭১ সাল) আততায়ী কৃত ধৃত হন এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৭ই ডিসেম্বর তার লাশ উদ্ধার করে আজিমপুর গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার পৈত্রিক নিবাস ছিল কুষ্টিয়া জেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে।





ড. সিরাজুল হক খান

ড. সিরাজুল হক খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ছিরেন। ১৯২৪ সালে নোয়াখালী জেলার সাতকুচিয়া গ্রামে তার জন্ম। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৩৯ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক এবং ১৯৪১ সালে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। দু'বছর সরকারি চাকুরি করার পর তিনি ফুলগাজী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে বি. টি. পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এড্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ-বছরই তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখান থেকে তিনি ড. অফ এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন।

ড. সিরাজুল হক খান স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ড অনুমোদিত বহু পাঠ্য পুস্তক (ইংরেজি, বাঙ্লা, ইতিহাস) রচনা করেছেন। একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি আল্বদর বাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়ে নির্মমভাবে নিহত হন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন।



সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকার খিলগাঁওয়ে হাত-মুখ বাঁধা শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকী ও বাবুল-এর লাশ।



হুমায়ুন কবির

হুমায়ুন কবীর ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরুণ শিক্ষক। বাংলাদেশ লেখক শিবির এবং বাঙ্লা একাডেমীর সংগে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল। তিনি কাব্যচর্চা করতেন। পত্র-পত্রিকায় তার প্রচুর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হুমায়ুন কবীর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার কনিষ্ঠভ্রাতা ফিরোজ কবির তো মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন স্বাধীনতার সূর্য। তারপরও যে তাকে মরতে হয়েছে ঘাতকের নির্মমহস্তে, এটা ছিল অভাবনীয়।

১৯৭২ সালের ৬ই জুন অর্থাৎ যুদ্ধ বিজয়ের মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস পরে হুমায়ুন কবিরকে রাতের অন্ধকারে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয়। কারা তাকে হত্যা করেছে, জানা যায় নি। তবে আততায়ীরা যে স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ, তাতে সন্দেহ ছিল না। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায় না। যুদ্ধকালে যাদের মনের অভিব্যক্তি ছিল—' আমরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'— তাদেরই একজন অকুতোভয় তরুণ এভাবে অকালে ঝরে গেল। তিনি তার কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমিত ইস্পাত' প্রকাশনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় তা' প্রকাশিত হয় নি। দুভাগ্য যে, তিনি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ দেখে যেতে পারেন নি। দেখে যেতে পারেন নি তার তৃতীয় সন্তানের (ছেলে) মুখ। তার মৃত্যুর ক'মাস পরে সেই শিশুটির জন্ম হয়েছে।



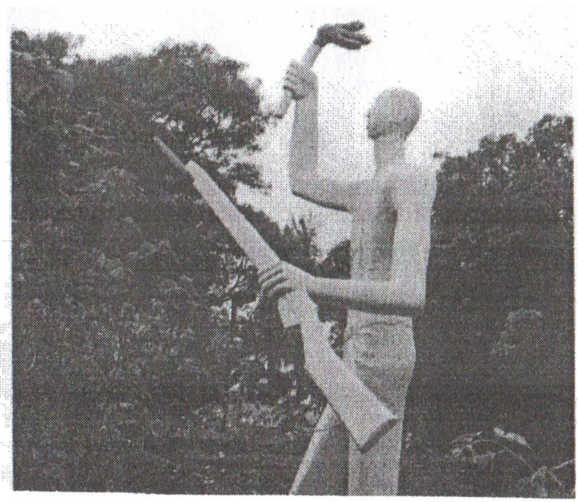
ড. ফয়জুল মহী

ড. ফয়জুল মহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করতেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। ছাত্র জীবনেও তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে তার প্রথম বিভাগ ছিল। বি. এড্ এবং এম. এড্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৬৮ সালে সেখান থেকে এম. এ. এবং ড. অফ এডুকেশন ডিগ্রী অর্জন করেন।

ড. ফয়জুল মহী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তার পরিচিত মহলকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধ্যমতো অর্থসাহায্যও করে গেছেন।

ড. ফয়জুল মহী সাহিত্য চর্চা এবং সংগীত চর্চা করতেন। খেলাধুলাতেও তার আগ্রহ ছিল। পত্র-পত্রিকায় তার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

'৭১-এর ১৪ই ডিসেম্বর সকালে আলবদর বাহিনী তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। মীরপুরের বধ্যভূমিতে ঘাতকের নির্মম হস্তে তার জীবনাবসান ঘটে।





ড. মোঃ সাদত আলী

ড. মোঃ সাদত আলী ১৯৪২ সালে নরসিংদীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. কম. (অনার্স) এবং ১৯৬৪ সালে এম. কম পাশ করেন। অল্প কিছুদিন নরসিংদী কলেজে অধ্যাপনার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি আমেরিকা যান। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে (১৯৬৮ সালে) তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। পরে তিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। পত্র-পত্রিকায় তার কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে এপ্রিল ঢাকা থেকে নরসিংদীর বাড়িতে যাবার পথে বর্বর পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্মমভাবে নিহত হন।



২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ : স্বাধীনতার বলি তৎকালীন সেকেন্ড ক্যাপিটালে (শেরেবাংলা নগরে) আবিষ্কৃত গণকবরে স্বাধীনতাকামী মানুষের পচনশীল লাশ।



মহসিন আলী দেওয়ান

বগুড়া জেলার জয়পুরহাট থানায় ভুটিয়াপাড়া গ্রামে ১৯২৯ সালের পহেলা জানুয়ারীতে মহসিন আলী দেওয়ান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় এম. এ. পাশ করেন। প্রথমে তিনি নওগাঁ কলেজে অধ্যাপনার চাকুরি নেন। অতঃপর বগুড়া আজিজুল হক কলেজে তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। এখান থেকে পদত্যাগ করে শেরপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে তিনি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন।

মহসিন আলী দেওয়ান অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা করতেন। ছাত্রজীবনেই তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ-এ সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। সেগুলোর নামঃ—

১। অতএব (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

২। সাপ্তাহিক বগুড়া বুলেটিন

৩। উত্তরবঙ্গ বুলেটিন (অর্ধ সাপ্তাহিক)

৪। জনমত (সান্ধ্য দৈনিক)

৫। মহাস্থান (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

মহসিন আলী দেওয়ান শিক্ষানুরাগী, সমাজহিতৈষী এবং সংগঠক হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। বগুড়া প্রেসক্লাব, বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং বগুড়া জেলা পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং বগুড়া জেলা প্রেস মালিক সমিতি ইত্যাদি সংগঠন সমূহে তিনি সভাপতি ছিলেন। বগুড়া জেলা পরিষদের সদস্যও হয়েছিলেন। দেওয়ান বুক সেন্টার নামে একটি পুস্তক প্রকাশনা সংস্থাও চালাতেন। একটি ছাপাখানাও কিনেছিলেন। তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেছেন। ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। '৭১-এর ৩রা জুন পাক-বাহিনী কর্তৃক ধৃত এবং নিহত হন। এভাবেই এক বহুমুখী প্রতিভার জীবনাবসান ঘটে।

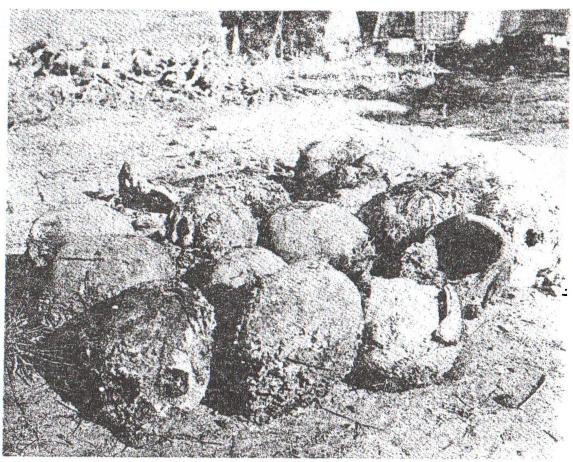


অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

রফিকুল ইসলাম দর্শনা কলেজের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যাপক। পটুয়াখালী জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন আহমদ। মেট্রিক পাশ করে তিনি ঢাকার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এসময়ে তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরে টেকনিক্যাল ছেড়ে বরিশালের বি. এম. কলেজে ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংগে জড়িয়ে পড়েন। যুব লীগের বরিশাল শাখার সদস্য হিসেবে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। দৈনিক ইত্তেফাকের বরিশালস্থ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন বহুকাল।

১৯৬৭ সালে রফিকুল ইসলাম ঢকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্‌লায় এম. এ. পাশ করেন। অতঃপর তিনি কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি কবিতা লিখতেন। বহু পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে ২৯শে জুলাই পাক-বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। তারপর আর কোনো সন্ধান মেলেনি। ধারণা করা হয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এটাই স্বাভাবিক ছিল।



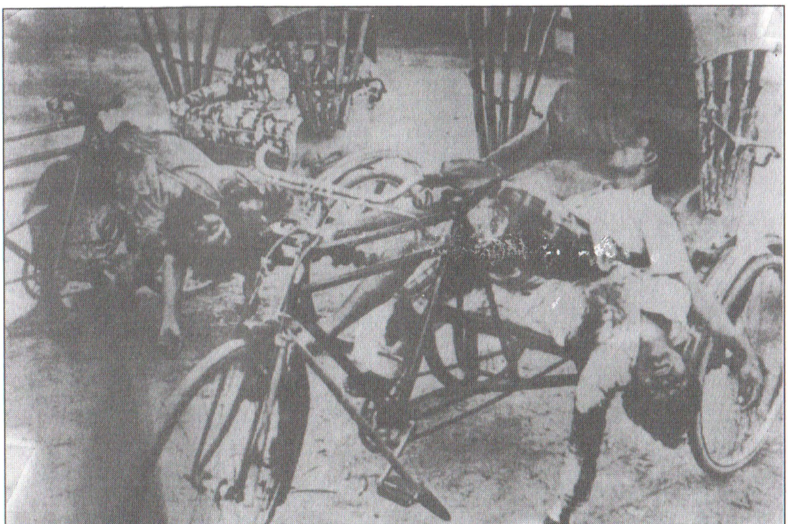


অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম

আবদুল কাইয়ুম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তার স্ত্রী মাস্তুরা কাইয়ুমও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। প্রকাশ, তারা উভয়েই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে এম. এ. পাশ করেন।

আবদুল কাইয়ূম ১৯৩৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার ঘাঘ্‌ড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মীর সুবেদ আলী। ১৯৫৬ সালে তিনি মেট্রিক পাশ করেন; ১৯৬২-তে মনোবিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

একাত্তরের ২৫শে নভেম্বর রাতে আততায়ীরা তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে গেল, কেন নিয়ে গেল, তা তখন জানা যায় নি। ডিসেম্বর মাসে পদ্মার চর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হয়, হানাদার পাক-বাহিনী অথবা তাদের দোসর রাজাকার কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন।



২৫ মার্চ ১৯৭১ : কালো রাতে বর্বর বাহিনীর নির্মম শিকার ঢাকার রাজপথের রিকশাওলা ও রিকশার যাত্রী



অধ্যাপক এস. এম. ফজলুল হক

এস. এম. ফজলুল হক সাহেব রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সহিত গণিতে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভের পর তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রাজশাহীতে বসবাস আশংকাজনক মনে করে ফজলুল হক নওগাঁয় গ্রামের বাড়িতে চলে যান। ভেবেছিলেন নিরাপদে থাকতে পারবেন। কিন্তু না, তিনি জীবনের নিরাপত্তা পান নি। ২৫শে এপ্রিল পাক-বাহিনী তার বাড়ি ঘেরাও করে। তারপর ঘর থেকে টেনে বের করে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হিংস্র ঘাতকেরা শুধু তাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তার মা, বোন এবং ভাইকেও হত্যা করে। বলতে গেলে, তিনি সপরিবারে নির্মম মৃত্যুর শিকার হলেন।



স্বাধীন বাংলার পতাকায় মোড়ানো ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত এক শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ।



অধ্যাপক হাবিবুর রহমান

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ১৯২৩ সালে নোয়াখালী জেলার বালিয়াধারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তপাড়া হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তিনি সোনার মেডেল পান। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এস-সি পাশ করেন। এ পরীক্ষাতেও তিনি সোনার মেডেল লাভ করেন। এখান থেকে তিনি বি. এস-সি (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক পেয়ে এম. এস-সি পাশ করেন। তাছাড়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. ডিগ্রী পান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজশাহীতেই ছিলেন। ১৫ই এপ্রিল তিনি পাক-সেনা কর্তৃক ধৃত হন। তিনি আর কখনও বাসায় ফিরে আসেন নি। পাক-সেনারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। দুই পুত্র এবং চার কন্যা নিয়ে তার স্ত্রী বৈধব্যজীবন যাপনে বাধ্য হলেন।



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ : বেলা দুটোর সময় সাকুরার সামনে গুলি বিনিময়ে নিহত পাক-সেনা এবং সমর্পিত অস্ত্রশস্ত্র।



অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হেসেন

মোয়াজ্জেম হোসেন বাগেরহাটের প্রফুল্লচন্দ্র (পি. সি.) কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করে ১৯৫৫ সালে পি. সি. কলেজে যোগদান করেন। অর্থনীতি বিষয়ে তিনি কয়েকটি মূলবান গ্রন্থ্ রচনা করেছেন।

১৯৭১-এ পাক বাহিনীর দোসর রাজাকাররা গ্রামে-গঞ্জে লুট-তরাজ করতো। অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন তাতে বাধা দিতেন। তিনি মুক্তিবাহিনী গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একসময়ে ভারতে গিয়ে তিনি ট্রেনীং নেন। তারপর দেশে ফিরে এসে বিভিন্নস্থানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। '৭১-এর ২৮শে অক্টোবর রাতে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। অকালে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন এক বুদ্ধিজীবী বীর যোদ্ধা।

অধ্যাপক আবুল হাশেম মিয়া

সাবেক ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত পাঁচগাঁও গ্রামে অধ্যাপক আবুল হাশেম মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী সরকারি কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করেও বিভিন্নভাবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করেছেন।

নোয়াখালী শত্রুমুক্ত হবার পর শহরে বিজয় মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন আবুল হাশেম মিয়া। একটি দালানের পাশ দিয়ে মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল। এই দালানে কতিপয় পলাতক রাজাকার আল্‌বদর আশ্রয় নিয়েছিল। তারা এই মিছিলের উপর গুলী চালায়। তাতে মৃত্যুবরণ করে মিছিলকারী কয়েকজন। আবুল হামেম মিয়াও সেই মৃতদের মধ্যে একজন। স্বাধীনতার সূর্যোদয়ও তাকে ঘাতকদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি।

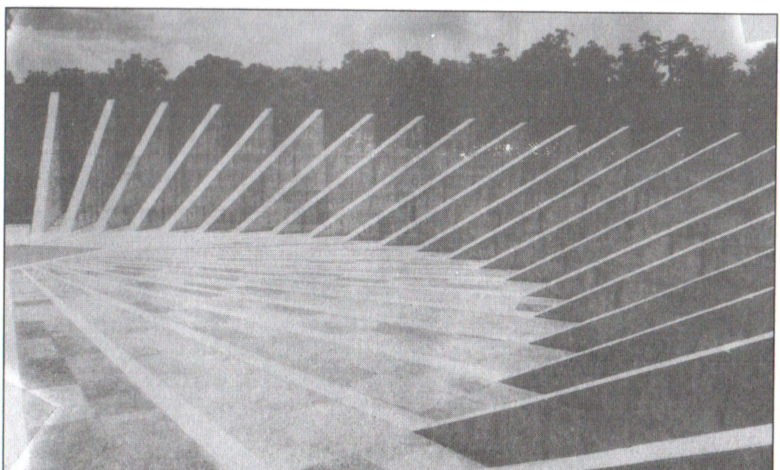


অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার

সুখরঞ্জন সমাদ্দার বরিশাল জেলার বানারী পাড়া থানায় ১৯৩৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কার্তিক চন্দ্র সমাদ্দার একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

সুখরঞ্জন সমাদ্দার বাইশারী হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। আই. এ. পড়েছেন বরিশালের বি. এম. কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে বি. এ. (অনার্স) এবং এম. এ. পড়েন। পাশ করার পর অল্প কিছুদিন গোপালগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনার চাকুরি পান।

একাত্তরের ১৪ই এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে পাক-সেনারা ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর কখনও বাসায় ফিরে আসেন নি। পাক-সেনারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হয়। এ-সময়ে তার বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বছর তিনমাস।



মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ : মেহেরপুরের আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। পরে এখানেই লাখো শহীদের স্মৃতির প্রতীক হিসেবে এই সৌধটি নির্মাণ করা হয়।



লেফটেন্যান্ট কর্নেল মঞ্জুরুর রহমান

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মঞ্জুরুর রহমান ছিলেন ঝিনাইদ ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি ক্যাডেট কলেজের চাকুরিতে আসার পূর্বে সামরিক বাহিনীতে অফিসার ছিলেন। '৭১-এর ১৬ই এপ্রিল তাকে হানাদার পাক-বাহিনী যশোহর সেনা-কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি।

১৮ই এপ্রিল কুষ্টিয়া থেকে একদল পাকসেনা এসে কর্নেল মঞ্জুরুর রহমানের বাঙলো ঘেরাও করে। তার মূল্যবান জিনিসপত্র সব লুট করে নিয়ে যায়। শুধু সম্পদ লুট করেই হানাদার পশুরা সন্তুষ্ট হয় নি। তার বাবুর্চি, কলেজের দারোয়ান, মালী সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই সংগে তাকেও গুলী করে হত্যা করা হয়। এভাবে এক সাহসী বীরের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে সেদিন বর্বর পাকসেনাদের স্টেনগানের গুলীতে।



১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ : রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে লাশের ছড়াছড়ি



সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার

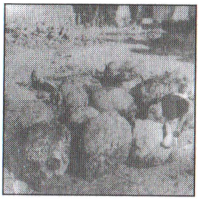
শহীদুল্লাহ কায়সারের জন্ম ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে। তার অনুজ জহির রায়হানের জন্ম ১৯৩৩ সালে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, অন্ততঃ তারও দু'-এক বছর পূর্বে তার জন্ম হয়েছে। পান্না চৌধুরীর সংগে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালে। তিনি যথেষ্ট অধিক বয়সে বিয়ে করেন। তার প্রথম সন্তান কন্যা শমীকায়সার, বর্তমানে টিভি নাটকের বিখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার পুত্র 'অমির' জন্ম হয়। পান্না চৌধুরী (পান্না কায়সার) বাংলাদেশের মহিলা সাংসদ এবং পেশায় কলেজের অধ্যাপিকা।

শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিচয় বহুমুখী। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, সংগঠক ইত্যাদি সকল পরিচয়েই তিনি ছিলেন স্বনামধন্য। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বউ' -এর কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে দর্শক নন্দিত হয়েছে। ১৯৬৩ সালে এ-উপন্যাসের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার পেয়েছেন। তার 'সংশপ্তক' উপন্যাস পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ধারাবাহিক টিভি নাটকও জনপ্রিয় হয়েছে। তার অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ (১) তিমির বলয় (উপন্যাস) (২) রাজবন্দীর রোজ নাম্‌চা (আত্মজীবনীমূলক) (৩) পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (ভ্রমণ কাহিনী)।

শহীদুল্লাহ কায়সার দৈনিক সংবাদ-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক।

অল্প বয়স থেকেই শহীদুল্লাহ কায়সার রাজনীতি সচেতন ছিলেন। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সেকালে পাকিস্তানে এ-পার্টি ছিল নিষিদ্ধ। তাই অনেক সময় তাকে পালিয়ে কাটাতে হয়েছে। ১৯৫৮ সালে আইউব খানের শাসনামলে তিনি গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাক-বাহিনী বাঙালি নির্যাতনে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ-সময়ে শহীদুল্লাহ কায়সার দেশত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনী তাকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান মেলেনি। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, তিনি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে।



জহির রায়হান

জহির রায়হান ছিলেন যশস্বী চলচ্চিত্র পরিচালক এবং কথাশিল্পী। তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের অনুজ তিনি। তার জন্মস্থান ফেনীর মজুপুর গ্রামে। ১৯৩৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তিনি আলীয়া মাদ্রাসায় মোদাররেস ছিলেন।

জহির রায়হান কিছুকাল আলীয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছেন। পরে মাদ্রাসা ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি কৃতিত্বের সহিত মেট্রিক পাশ করেন। জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এস-সি পাশ করেন ১৯৫৩ সালে। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় বি. এ (অনার্স) পাশ করেন। এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হয়েও তিনি পরীক্ষা দেননি।

জহির রায়হান বামপন্থী রাজনীতির সংগে জড়িত ছিলেন। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ-কারণে তিনি কিছুদিনের জন্য কারাবন্দী ছিলেন। একসময়ে ফটোগ্রাফী শেখার জন্য তিনি কোলকাতায় যান। ছ'মাস পরে দেশে ফিরে আসেন। রাজনৈতিক কারণে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। এবার তাকে সাড়ে তিন মাস জেলে থাকতে হয়।

ছাত্র জীবনেই জহির রায়হান চলচ্চিত্রের সংগে জড়িত হন। লাহোরের চলচ্চিত্র পরিচালক কারদার তাকে সহকারী হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর পরিচালক সালাউদ্দীন এবং এহতেশামের সহকারী হন। 'যে নদী মরু পথে এবং 'এদেশ তোমার আমার' ছবি দু'টিতে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তার পরিচালিত প্রথম ছবি 'কখনো আসেনি' মুক্তি পায়। অতঃপর তিনি তৈরি করেন কয়েকটি বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু ছবি। সেগুলোর নাম— সোনার কাজল, কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, জীবন থেকে নেয়া, আনোয়ারা, সঙ্গম, বাহানা, জ্বলতে সূরজকে নীচে, Let there be light ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি কয়েকটি ছবি প্রযোজনাও করেছেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মাত্র দশ বছরে চলচ্চিত্র জগতে তিনি যথেষ্ট বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। পাকিস্তানে তিনিই প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি একাধিকবার অর্জন করেছেন চলচ্চিত্র পুরস্কার। এককালের

খ্যাতনাম্নী চিত্রাভিনেত্রী সুমিতা দেবী, সুচন্দা এবং ববিতা জহির রায়হানের আবিষ্কার। প্রকাশ, এদের প্রথম দু'জন তার স্ত্রী এবং তৃতীয় জন শ্যালিকা।

জহির রায়হানের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা—৬। তাদের নাম ঃ

১। সূর্য গ্রহণ (গল্প গ্রন্থ / প্রকাশকাল—১৩৬২)।

২। শেষ বিকেলের মেয়ে (উপন্যাস / প্রকাশকাল—১৩৬৭)।

৩। হাজার বছর ধরে (উপন্যাস / প্রকাশকাল—১৩৭১)।

৪। আরেক ফাল্গুন (উপন্যাস / প্রকাশকাল—১৩৭৫)।

৫। বরফ গলা নদী (উপন্যাস / প্রকাশকাল—১৩৭৬)।

৬। আর কতদিন (উপন্যাস / প্রকাশকাল—১৩৭৭)।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই (১৯৬৪ ইং সালে) তাকে এ উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার দেওয়া হয়। আর, উপন্যাস রচনায় মূল্যবান অবদান রাখার জন্য তাকে ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমী (মরনোত্তর) একুশে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করেন।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি মুজিবনগরে যান। এ-সময়ে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্বর হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করছিলেন Stop Genocide নামে। দেশ স্বাধীন হবার পর মুজিবনগর থেকে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ফিরে এসে জানতে পেলেন যে, তার অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারকে আলবদর বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে, কোথায়ও তার সন্ধান মিলছে না। '৭২-এর ৩০শে জানুয়ারি তিনি তার নিখোঁজ ভাইয়ের সন্ধানে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে গেলেন। কীভাবে কোথায় তার জীবনাবসান হলো, আজও তা জানা যায়নি। স্বাধীনতাও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। তিনি দেশ স্বাধীনের পরেও হলেন হানাদার বাহিনীর নীল নকশার শিকার।





সিরাজুদ্দীন হোসেন

সিরাজুদ্দীন হোসেন সাংবাদিক ছিলেন। যশোর জেলার শর্শুনা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। তিনি কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়তেন। তখনও ভারত বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হয় নি। ১৯৪৫ সালে কোলকাতার দৈনিক আজাদ পত্রিকায় তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে প্রুফ রিডারের চাকুরি করতেন। কিছুকালপর অনুবাদকের কাজ পেয়ে যান। এই সামান্য রোজগার থেকে তার কলেজের ব্যয় নির্বাহ হতো। সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি তার এখান থেকেই।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পর দৈনিক আজাদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সিরাজউদ্দীন হোসেন দৈনিক আজাদ-এ সহকারী বার্তা সম্পাদকের চাকুরি গ্রহণ করলেন। ১৯৫৪ সালে আজাদ-এর চাকুরি ছেড়ে দৈনিক ইত্তেফাক-এ চাকুরি নিলেন। এই কর্মক্ষেত্র তিনি কখনও পরিবর্তন করেন নি। ১৯৭১-এর ১০ই ডিসেম্বর তিনি আলবদর বাহিনী কর্তৃক ধৃত হন। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কোথায়, কীভাবে তিনি নিহত হন, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।



২৫ মার্চ ১৯৭১ : নির্মম নৃশংসতা। মধ্যরাতে পাক হানাদারবাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে যে ব্যাপক বীভৎস খেলায় মেতেছিল তা নাৎসীবাহিনীর নারকীয়তাকেও হার মানায়।



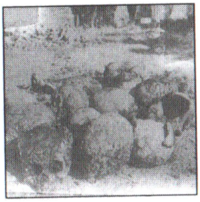
নিজামুদ্দীন আহমেদ

নিজামুদ্দীন আহমেদ প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন। ঢাকার তৎকালীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমাধীন মাওয়া গ্রামে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আরও কতিপয় সামাজিক সংস্থার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি তৎকালীন পি. পি. আই. সংবাদ সরবরাহ সংস্থায় যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি এই সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নিজামুদ্দীন আহমেদ বি. বি. সি. এসোসিয়েটেড প্রেস অফ অ্যামেরিকা এবং ইউ. পি. আই-এর সংবাদদাতা ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি ইরান, মিশর, তুরস্ক, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশে গিয়েছেন।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পাক-বাহিনীর বর্বরতার খবর বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করেছেন। ১২ই ডিসেম্বর আল্‌বদর বাহিনী নিজামুদ্দীন আহমেদকে তার বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়। এই নির্ভীক সাংবাদিক আর কখনো ঘরে ফিরে আসেন নি। এ-ভাবেই তিনি চিরতরে হারিয়ে গেলেন।



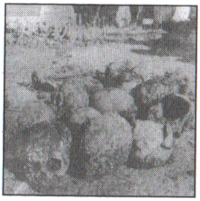


সৈয়দ নজমুল হক

সৈয়দ নজমুল হক সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৪১ সালের ৫ই জুলাই খুলনার কান্দাপাড়া গ্রামে তার জন্ম হয়। তার পিতা সৈয়দ এমদাদুল হক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিক। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সি. এস. পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 'কনভোকেশন কেস' -এ আসামী ছিলেন বলে তখন তিনি সরকারী চাকুরি পান নি।

সৈয়দ নজমুল হক সেকালের পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর চিফ রিপোর্টার ছিলেন। তাছাড়া কলম্বিয়া ব্রড কাস্টিং সার্ভিস এবং হংকং-এর এশিয়ান নিউজ এজেন্সীর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি পাক-হানাদার বাহিনীর বর্বরতার খবর সরবরাহ করতেন। আগস্ট মাসে পাক বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠায়। সেখানে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য আদায়ের জন্য তাকে নির্যাতন করা হয়। শেষে নভেম্বর মাসে তাকে ঢাকায় পাঠায়। তবু বর্বর ঘাতক বাহিনীর কবল থেকে তিনি নিস্তার পাননি। ১১ই ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর কখনও ফিরে আসেননি। এ-ভাবেই এক অসময় সাহসী সাংবাদিক চিরতরে হারিয়ে গেলেন।





আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা

সাংবাদিক আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী জহিরউদ্দীন আহমদ।

গোলাম মোস্তফা ছিলেন 'পূর্বদেশ' পত্রিকার সিনিয়র সাব এডিটর। ১৯৭০-এর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বিয়ে করেন। '৭১-এর ডিসেম্বরে তার একমাত্র সন্তান (প্রথম সন্তান) অভীর বয়স হয়েছিল নয় মাস। আর, স্ত্রীর গর্ভে ছিল অনাগত দ্বিতীয় সন্তান। সেই সন্তানের মুখ দেখবার সুযোগ তার হয়নি। '৭১-এর ১১ই ডিসেম্বর তার গোপীবাগের বাসায় প্রবেশ করে আলবদর বাহিনীর তিনজন সদস্য। তারা তাকে কিছু বলার অজুহাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর তার আর কোনো খবর সংগ্রহ করা যায় নি। এ-সময়ে এই তরুণ সাংবাদিকের বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। হিংস্র আল্ বদরের পাশবিকতায় অকালে ফুরিয়ে গেল একটি নিরপরাধ তরুণের জীবন।



২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ : স্বাধীনতার বলি তৎকালীন সেকেন্ড ক্যাপিটালে (শেরেবাংলা নগরে) আবিষ্কৃত গণকবরে স্বাধীনতাকামী মানুষের পচনশীল লাশ।



জহিরুল ইসলাম

জহিরুল ইসলাম ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নিবেদিত প্রাণ। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ'। পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় ঢাকার পল্টন ময়দানে নাট্যাভিনয় এবং সংগীত ও সাহিত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন নির্ভয়ে। সেই আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি লিখেছেন 'অগ্নি সাক্ষী' উপন্যাস। তার লেখা কয়েকটি উপন্যাস ঃ

১। অগ্নি সাক্ষী

২। অজগাঁয়ের বেগম

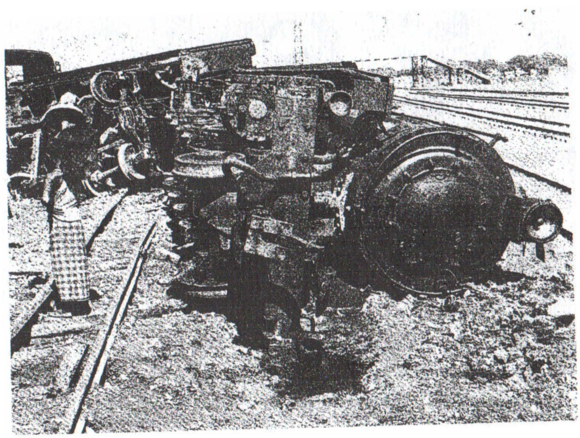
৩। ব্রীজের তলায় থাকি

৪। মেয়েরা পর্দানসীন

৫। অন্য নায়ক

৬। ক্ষেত মজুর

১৯৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের সময়ে জহিরুল ইসলাম ঢাকা শহরে থাকতে সাহস পাননি। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন জিঞ্জিরায়। কিন্তু জীবন বাঁচাতে পারেন নি। ২রা এপ্রিলে দখলদার পাক-বাহিনীর অপারেশনে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন।





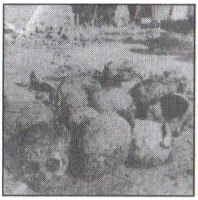
গোলাম রহমান

গোলাম রহমান ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী। তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। তার ইচ্ছা ছিল প্রকাশক হবার। তিনি লিখতেন প্রচুর। ছোটদের জন্যই লিখেছেন অধিক। তার ছোটদের জন্য লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম ঃ

১। ঈশপের গল্প
২। চকমকি
৩। জ্যান্ত ছবির ভোজবাজি
৪। পানুর পাঠাগার
৫। বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি
৬। বুদ্ধির ঢেঁকি
৭। রকমফের
৮। রুশদেশের রূপকথা

তিনি পেয়েছিলেন বাঙলা একাডেমীর শিশুসাহিত্য পুরস্কার।

গোলাম রহমান '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অপঘাত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি নিহত হন। কেন, কীভাবে তা জানা যায়নি। শুধু জানা গেছে, তিনি জীবন থেকে হারিয়ে গেছেন চিরতরে।



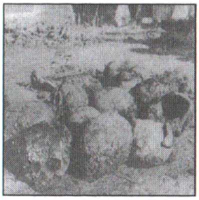
সাংবাদিক আহসান আলী

আহসান আলী সাবেক রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শেখের পুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চাচার কাছে জামালপুর চলে যান। সংবাদপত্র বিক্রী করে তাকে লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করতে হতো। এ কাজের মধ্য দিয়েই তিনি সাংবাদিকতায় জড়িয়ে যান। দৈনিক জেহাদ, দৈনিক মিল্লাত, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা প্রভৃতি পত্রিকায় সংবাদ এবং প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে দৈনিক সংবাদ এবং দৈনিক ইত্তেফাক-এর নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। তাছাড়া দৈনিক পূর্বদেশ এবং দৈনিক পাকিস্তান-এর জামালপুরস্থ প্রতিনিধি ছিলেন।

আহসান আলী রাজনীতি করতেন। তিনি ছিলেন জামালপুরের সংগ্রামী ন্যাপনেতা। '৭১-এর ২৮শে জুলাই তিনি সপরিবারে ঢাকায় আসছিলেন। তখন জামালপুর রেলস্টেশনে তিনি আল্‌বদর বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। অকথ্য নির্যাতন করে তাকে হত্যা করা হয়। এ-ভাবে একজন নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকের জীবনাবসান ঘটে।



স্বাধীন বাংলার পতাকায় মোড়ানো ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত এক শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ।



কমরেড আলতাফ মাহমুদ

আলতাফ মাহমুদ ছিলেন মূলতঃ গায়ক, সুর শিল্পী। অথচ অভিনেতা, সংগঠক, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তার পরিচিতি অল্প ছিল না। ছিলেন যুবলীগের কর্মী। পরবর্তীতে বামরাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট হন। তিনি গান লিখে নিজে সুর দিয়ে স্বকণ্ঠে গাইতেন। গণসংগীতশিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। ভাষা আন্দোলনের উপরে লেখা আবদুল গাফফার চৌধুরীর বিখ্যাত গান— 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'-তে কণ্ঠ ও সুর দিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ। এই একটি গানেই তিনি অমরত্ব পেতে পারতেন। তবু তিনি প্রতিষ্ঠার জন্য চলচ্চিত্রেও সংগীত পরিচালনা করেছেন।

জনপ্রিয় সুরকার, গায়ক আলতাফ মাহমুদ সাংগঠনিক কাজেও সুদক্ষ ছিলেন। তিনি পোস্টার লিখতেন। কার্টুন আঁকতেন, ফেস্টুন বানাতেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি কারাবরণও করেছেন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বর্বর পাক-সেনারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। চিরতরে হারিয়ে গেল এক সুরেলা গানের পাখী।



ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৪০ জন নেতৃস্থানীয় নেতাকে মিথ্যা আলোচনার আশ্বাস দিয়ে ডেকে এনে এভাবেই নৃশংসভাবে হত্যা করে বর্বর বাহিনী।



কবি মেহেরুন্নেসা

তিনি 'নূরজাহান' হন নি। শুধু মেহেরুন্নেসা। তবে কবি হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অভাবী সংসারে অসুস্থ পিতা, মা এবং দু'টো ভাই নিয়ে তার দিন চলছিল কায়ক্লেশে। তার একার উপার্জনে সংসার চলতো। বাংলা একাডেমীতে কপি করার কাজ বেলা দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত একটানা। এ-কাজ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। চুক্তিভিত্তিক ছিল তাই এক সময়ে তা' ফুরিয়ে গেল। তারপরও পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। কখনও পত্রিকা অফিসে ফিচার লেখা, প্রুফ দেখার কাজ করেছেন। একসময়ে বিদেশী রেডিও তৈরির কারখানায় কাজ পেয়েছিলেন। মেহনতের কাজ, ভদ্র পেশা নয়। তবু করতে হয়েছে সংসারের প্রয়োজনে। এক সময়ে তার অসুস্থ পিতার মৃত্যু হলো। তার উপরে চাপলো সংসারের অভিভাবকত্ব। এদিকে তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছিল। মা এবং ছোট ভাই দু'টিকে অসহায় ফেলে রেখে অন্য কোনো সংসারে বউ হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'৭১-এর সাতাশে মার্চ হানাদার পাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করলো কবি মেহেরুন্নেসাকে। তার সংসারের অন্যান্য সদস্য তার মা এবং ভাই দু'টিও সেদিন রেহাই পায়নি বর্বর জহলাদ বাহিনীর কবল থেকে। সেদিন কবি মেহেরুন্নেসার মতো একটি সুগন্ধী ফুলকে বাঁচানো গেল না। তিনি কি লিখে যেতে পেরেছেন—

'গরীব গোরে দীপ জ্বেলোনা
ফুল দিয়োনা কেউ ভুলে
শামা পোকার পাখ না পড়ে
গান না গাহে বুলবুলে!'



কবি সেলিনা পারভিন

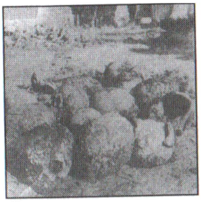
নোয়াখালীর কল্যাণ নগর গ্রামে ১৯৩১ সালে সেলিনা পারভিন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা টিচার ট্রেনিং স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তার নাম মোঃ আবিদুর রহমান।

সেলনা পারভিন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ তার ঐপর্যন্তই। তবে বাঙ্লা সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন। ১৩/১৪ বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি ছবি আঁকা, নাচ, গান, সেলাই শিখেছিলেন।

অল্প বয়সেই সেলিনা পারভিনের বিয়ে হয়েছিল। এ-বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। ১৯৬২ সালে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এ বিয়েও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অতঃপর তার একমাত্র পুত্র সুমনকে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হন। প্রথমে তিনি রোকেয়া হলের মেট্রনের চাকুরি গ্রহণ করেন। এ চাকুরি ছেড়ে তিনি রিসেপশনিস্ট এর চাকুরি নিয়েছিলেন। বেতন ভালোই ছিল, কিন্তু এ-চাকুরি পছন্দ হয়নি তার। তাই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন। 'ললনা' নামের এক পত্রিকায় তিনি চাকুরি নিয়েছিলেন। 'শিলা লিপি' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

কবি সেলিনা পারভিন ছিলেন জেদী, স্বাধীনচেতা এবং উচ্চাভিলাষী। একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। বামপন্থী রাজনীতিতে তার অনুরাগ ছিল। একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে পাওয়া গিয়েছিল তার ক্ষতবিক্ষত লাশ। আর কোনোদিন তিনি লিখবেন না— 'এখনও প্রতারকের হাসিতে আমি শিশুকে দেখি।'



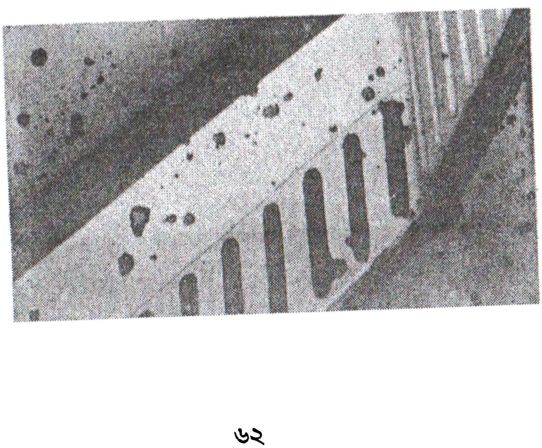


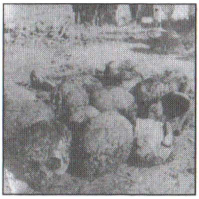
নজমুল হক সরকার

নজমুল হক সরকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন। পেশায় ছিলেন আইনজীবী। রাজশাহীর হরিরামপুর গ্রামে ১৯৩২ সালে তার জন্ম। ১৯৪৯ সালে তিনি মেট্রিক পাশ করেন। বি. কম. পাশ করেন রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি. ডিগ্রী লাভ করে ১৯৬১ সালে রাজশাহী উকিল-বারের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৫৮ সালে নজমুল হক সরকার আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। প্রথমে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং পরে সভাপতি হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি রাজশাহী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন।

নজমুল হক সরকারের নিজস্ব বাসভবন ছিল রাজশাহী শহরের রাণী বাজারে। এখানে তিনি স্ত্রী, তিনটি শিশুপুত্র এবং বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বসবাস করতেন। '৭১-এর পঁচিশে মার্চ রাতে তার পরিবারের সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি বাড়ি থেকে চলে যান কাদিরগঞ্জে। শোনা যায় পথিমধ্যে পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়ে নির্মমভাবে নিহত হন।





শহীদ সাবের

১৯৩০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর কক্সবাজারের ঈদগাঁ গ্রামে শহীদ সাবেরের জন্ম। তার পিতার নাম সালামত উল্লাহ্। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঈদগাঁ প্রাইমারী স্কুলে। তারপর কোলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়েন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৪৯ সালে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্র ফেডারেশন ছিল বামপন্থী।

১৯৫০ সালে আই. এ. প্রথম বর্ষে অধ্যয়ন কালে রাজনৈতিক কারণে তাকে আটক করা হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু চার বছর নির্বিচারে আটক থাকার ফলে তার মস্তিষ্কে কিছুটা গোলমাল দেখা দেয়। বদ্ধ পাগল না হলেও তিনি সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিলেন না। তিনি কখনও কখনও কবিতা লিখতেন। কখনও বা দৈনিক পত্রিকা অফিসে এবং প্রেস ক্লাবে যেতেন।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৩১শে মার্চ সকালে দৈনিক সংবাদ অফিসে পাক হানাদার বাহিনী হামলা করে। সংবাদ-অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সে সময়ে শহীদ সাবের অফিসের মেঝে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে তার শোচনীয় মৃত্যু হলো। কেউ তার সৎকার করে নি। কাকে ঠুক্‌রিয়ে খেয়েছে তার পোড়া লাশ। তার আসল নাম ছিল শহীদুল্লাহ। তবে শহীদ সাবের নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।





এ. কে. এম. সিদ্দিক

সাবেক ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে আনুমানিক ১৯২৫ সালে এ. কে. এম. সিদ্দিক জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুল লতিফ বিশ্বাস বিখ্যাত আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ।

এ. কে. এম. সিদ্দিক ঢাকা জজকোর্ট এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করতেন। আইনবিদ হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। '৭১-এর ১৪ই ডিসেম্বর পাকহানাদার বাহিনীর দোসর কুখ্যাত আল্‌বদর বাহিনী তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তিনি আর বাড়িতে ফিরে আসেননি। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ঘাতক বাহিনী তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।



২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ : ঢাকায় হরতাল। ২৪ ঘণ্টা কার্ফু। হাজার হাজার মানুষের মিছিল। মিছিলে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ মতিউরকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে জনতা।



এডভোকেট আবদুল জোব্বার

সাবেক বগুড়া জেলার মঙ্গলবাড়ি গ্রামে ১৯২৬ সালে আবদুল জোব্বার জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সফের উদ্দিন আহমদ। ১৯৪৩ সালে তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি. ডিগ্রী লাভ করেন। বগুড়া কোর্টে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ঢাকায় কিছুদিন সাংবাদিকতার কাজও করেছেন।

আইন ব্যবসায়ে দক্ষতার কারণে আবদুল জোব্বার অল্পদিনেই সুনাম অর্জন করেন। পরে তিনি সরকারি উকিল নিযুক্ত হন। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর হাতে তিনি ধরা পড়েন মে মাসের ১৬ তারিখে। তিনি নৃশংস মৃত্যুর শিকার হলেও কোথায় কীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তা আজও জানা যায় নি।



২৫ মার্চ ১৯৭১ : কালো রাতে বর্বর হানদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। শুরু করেছিল হত্যাযজ্ঞ। তারই শিকার সাধারণ মানুষ।



লেফটেন্যান্ট মোঃ আনোয়ারুল আজীম

মোঃ আনোয়ারুল আজীমের জন্ম সাবেক রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার রানীনগর গ্রামে। ১৯৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা খানসাহেব মোহাম্মদ আফজল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে চাকুরিরত থাকা কালে এল. এল. বি. এবং এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

১৯৬৫ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আনোয়ারুল আজীম আন্তর্জাতিক ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় যান। শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ জন্য মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক পান। একসময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন।

১৯৭১ সালে আনোয়ারুল আজীম গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ চিনি মিলে প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন। ৫ই মে হানাদার পাকসেনা এবং বিহারীরা মিলে প্রবেশ করে মেশিনগানের গুলী চালায়। মিলের শ্রমিক-অফিসার কর্মরত ছিলেন দুই শতাধিক। আনোয়ারুল আজীমসহ সকলেই নৃশংসভাবে নিহত হলেন হিংস্র নরপশুদের গুলীর আঘাতে।





মামুন মাহমুদ

মামুন মাহমুদ রাজশাহীতে পুলিশের ডি. আই. জি. ছিলেন। তার মা শামসুন নাহার মাহমুদ বিখ্যাত লেখিকা এবং কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। তার মামা হাবীবুল্লাহ বাহার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একবার মন্ত্রী হয়েছিলেন। সুসাহিত্যিক হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল।

'৭১-এর ২৬শে মার্চ হানাদার পাক বাহিনী রাজশাহী ট্রেজারীতে হামলা চালায়। পুলিশ সে-হাম্‌লা প্রতিহত করে। পাক বাহিনী মামুন মাহমুদের কাছে কৈফিয়ত চায় এবং পাহারারত পুলিশদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। কিন্তু মামুন মাহমুদ পাক সেনাদের অন্যায় আবদার রক্ষা করেন নি। তারপর মিথ্যা অজুহাতে তাকে রংপুরের উদ্দেশে তারা ডেকে নিয়ে যায়। তাকে আর ফেরৎ দেওয়া হয় নি। তাকে অবশ্যই হত্যা করা হয়েছে। তবে কোথায় কখন এবং কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা কখনও জানা যায় নি।



২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় মিরপুরে হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের হাতে শহীদ মুক্তিকামী মানুষের উদ্ধারকৃত মাথার খুলি ও হাড়গোড়।



অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ তিনি এম. এ. ডিগ্রী অর্জনের পর ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ঢাকার বিক্রমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করলেও ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের প্রতি ছিল তার গভীর আগ্রহ। তাই লণ্ডন থেকে এফ. সি. এস. এবং আমেরিকা থেকে এম. সি. এস. ডিগ্রী পাওয়ার পরেও তিনি হন আয়ূর্বেদ শাস্ত্রী।

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ১৯১৪ সালে ঢাকা গেন্ডারিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন পৃথিবীর বৃহত্তম আয়ূর্বেদীয় ঔষধের কারখানা— সাধনা ঔষধালয়। ‘সাধনার ঔষধ গুণে-মানে এবং মূল্যের সুলভতায় ছিল সকলের পছন্দনীয়। তাই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো এর শাখা এবং এজেন্সী। ‘সাধনা’-র ঔষধ বিশ্বের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হানাদার বাহিনী এ-দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নর-নারী কাউকে রেহাই দেয়নি। তারপরও তারা বেছে বেছে দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেছে। নিরীহ নির্বিরোধ ব্যক্তিরাও রেহাই পায়নি বর্বর পশুদের কবল থেকে। অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ তখন প্রায় শতবর্ষ বয়সের স্থবির বৃদ্ধ। পাকিস্তানী পশুরা তার ঔষধ কারখানায় প্রবেশ করে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তার মৃত্যু যদিও অকাল মৃত্যু নয়,তবুও দারুণ মর্মান্তিক। যদিও তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন, তথাপি তখনও রত ছিলেন আয়ুর্বেদের সাধনায়। বর্বর পশুরা তার সাধনাকে পণ্ড করে দিল রাইফেলের গুলীতে, বেয়নেটের খোঁচায়।





দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা

আমাদের এ দরিদ্র দেশেও লাখো পতি-কোটিপতি অনেকেই আছেন। অধিকাংশ দরিদ্রের মধ্যে যারা বিত্তবান আছেন তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ জনদরদী সমাজ সেবক দানশীল ব্যক্তি বিরল। তারই মধ্যে ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব রনদা প্রসাদ সাহা। সংক্ষেপে আর. পি. সাহা। তিনি টাংগাইলের মির্জাপুরের লোক। তিনি পৈত্রিক সূত্রে সম্পদের অধিকারী হন নি। নিজের বুদ্ধি, কৌশল এবং শ্রমের মাধ্যমে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন।

আমাদের দেশে সাহা পদবী ধারীরা সাধারণতঃ মিষ্টান্নতৈরি এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় করেন। অবশ্য কাউকে কাউকে মুদী মনিহারী দোকান করতেও দেখা যায়। এরা হিসেবী ব্যবসায়ী এবং মিতব্যয়ীও বটে। রনদা প্রসাদ সাহা দারিদ্রের মধ্য থেকে নিজের চেষ্টায় প্রভূত অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে তথা কথিত হিসেবী কিংবা মিতব্যয়ী হননি। তিনি মানবসেবার ব্রত নিয়েছিলেন। মির্জাপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কুমুদিনী হাসপাতাল। এই হাসপাতাল পাকিস্তান আমলের একটি উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করতেন। শুধু তা-ই নয়। এ-ছাড়াও তিনি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শুধুই প্রতিষ্ঠাতা নন, ব্যয়ভারও বহন করতেন তিনিই। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মধ্য থেকে শেষোক্ত দু'টি চাহিদা তিনি যথাসাধ্য পূরণ করেছেন। তিনি মানবদরদী, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক, সর্বোপরি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাকে নির্দ্বিধায় 'দানবীর' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তিনি ছিলেন রীতিমতো এক বৃদ্ধ ব্যক্তি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এই অপূর্ব পরোপকারী নিরীহ লোকটিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তবু তার মৃত্যু নেই। তিনি মানব মনের মনিকোঠায় অমর হয়ে রয়েছেন।





ডাক্তার শামসুদ্দীন

ডাক্তার শামসুদ্দীন একজন প্রবীণ এবং নামজাদা চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি সিলেট মেডিকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। পাক-বাহিনীর বর্বর হামলার সময়ে তিনি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছেড়ে কোথায়ও যান নি। পাক-সেনাদের হাম্‌লায় আহত হয়ে যারা হাসপাতালে আসতেন, তার তত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা করা হতো। সেই সংগে মুক্তিযোদ্ধাদেরও সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ৯ই এপ্রিল সিলেট মেডিকেল কলেজের কাছে মুক্তি বাহিনীর সংগে পাক-সেনাদের যুদ্ধ হয়। এ-যুদ্ধে তিনজন পাকসেনা নিহত হলে পাক বাহিনী ক্ষেপে যায়। তারপর পাকবাহিনী হাসপাতাল ঘিরে ফেলে।

ডাক্তার শামসুদ্দীনসহ হাসপাতালের কয়েকজন কর্মচারীকে ধরে এনে গুলী করে হত্যা করা হয়। তারপর কয়েকদিন কারফিউ জারী ছিল। ১৩ই এপ্রিল এক ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হলে ডাক্তার শামসুদ্দীনের আত্মীয়রা হাসপাতালে এসে তাকে হাসপাতাল প্রাংগনে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানেই তার লাশ সমাহিত করা হয়। তার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্য মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় 'ডাক্তার শামসুদ্দীন হল'।



স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য শহীদানের সাথে জীবন বিসর্জন করেন সাপ্তাহিক 'শীলালিপি' সম্পাদিকা সেলিনা পারভীন।



ডাক্তার ফজলে রাব্বি

ডাক্তার ফজলে রাব্বি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষক এবং চিকিৎসক। তিনি ছিলেন মানবদরদী, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ন। শেখ মুজিব, মওলানা ভাষানী, তাজউদ্দীন আহমদ, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন তিনি। তার একমাত্র ছেলে টিংকু '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ সাহায্য করতেন।

ডাক্তার ফজলে রাব্বি চিকিৎসক হিসেবে খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। রোগীর প্রতি আন্তরিক দরদ ঢেলে চিকিৎসা করতেন। তিনি শুধুই পেশাদার ডাক্তার ছিলেন না, চিকিৎসা করা তার নেশায় পরিণত হয়েছিল। এই দরদী ডাক্তার বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। একাত্তরের ভয়ালদিনে হানাদার পাকসেনাদের দ্বারা ধৃত হয়ে তিনি শোচনীয় মৃত্যু বরণ করেন। কেউ জানতে পারেনি কোথায় কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে।



১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ : রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে লাশের ছড়াছড়ি



ডাক্তার আলীম চৌধুরী

ডাক্তার আলীম চৌধুরী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে তার সুনাম ছিল। তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন। পত্র-পত্রিকায় তার কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। '৭১-এ তার দু'টি সন্তান ছিল। দু'টিই মেয়ে। বড়টির নাম নীপা এবং ছোটটির নাম শম্পা। নীপার বয়স তখন ৪ বছর এবং শম্পার বয়স দু'বছর।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ডাক্তার আলীম চৌধুরী হাসপাতালের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে বাঁচতে চাননি পালিয়ে থেকে। বাঁচতেও পারেননি তিনি। সেই দুর্যোগময় দিনে হানাদার পাকবাহিনী এই তরুণ ডাক্তারটির জীবন কেড়ে নিলো হিংস্র হায়েনার মতো।



মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মিত "স্মৃতিসৌধ"।



ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা

মোহাম্মদ মোর্তজা পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চণ্ডীপুর গ্রামে ১৯৩১ সালের পহেলা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে মেট্রিক পাশ করেন কলকাতার বালিগঞ্জ সরকারী হাই স্কুল থেকে। ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এস-সি পাশ করে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাশ করেন।

মোহাম্মদ মোর্তজা ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম সাইদোমোর্তজা।

মোহাম্মদ মোর্তজা রাজনীতি ও সমাজসচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন ছাত্রজীবন থেকেই। তার কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থের নাম—

১। জনসংখ্যা ও সম্পদ (প্রবন্ধ)।

২। প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক (প্রবন্ধ)।

৩। চরিত্রহানীর অধিকার (উপন্যাস)।

৪। চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী (অনুবাদ)।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর হানাদার পাকবাহিনীর দোসর আল্‌বদর সদস্যরা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়। '৭২-এর ৪ঠা জানুয়ারি মীরপুর মাযারের কাছে তার লাশ উদ্ধার করে ৫ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। পরাধীন দেশে মৃত্যুবরণ তার ভাগ্যে ছিল, কিন্তু সমাধিস্থ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল স্বাধীন দেশেই। যার যা ভবিতব্য তা' এড়ানোর সাধ্য কারো নেই।





ডাক্তার জিকরুল হক

ডাক্তার জিকরুল হক ছিলেন মূলতঃ রাজনীতি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি অংগনের ব্যক্তি। অবিভক্ত ভারতে তিনি মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিলেন। তিনি পরে সৈয়দপুরের মুসলিম লীগের সম্পাদক হয়েছিলেন। সৈয়দপুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্প সাহিত্য সংসদ'-এর সংগে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জিকরুল হক আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হন। '৭১-এর ২৮শে মার্চ পাকবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে সৈয়দপুর সেনা নিবাসে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। ১২ই এপ্রিল তিনি ঘাতকের হাতে নিহত হন। পাক সেনারা শুধু তাকেই হত্যা করেনি। তার আরো দুই ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।



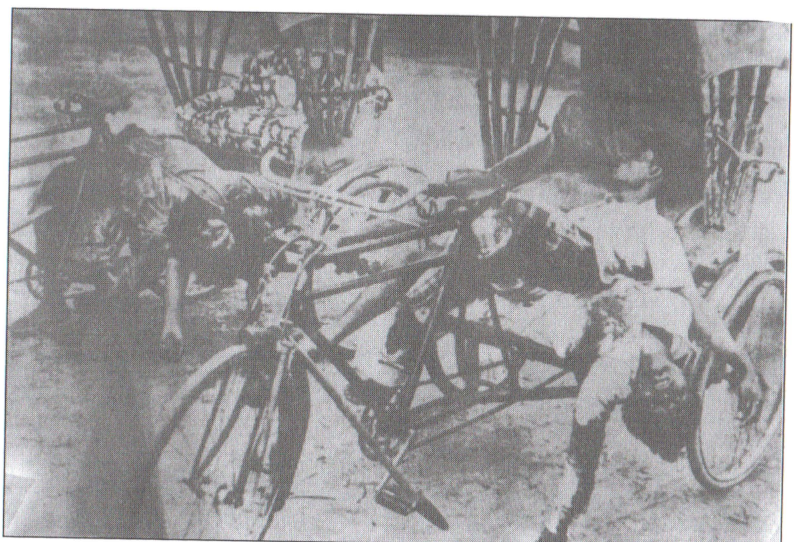
২৫ মার্চ ১৯৭১ : নির্মম নৃশংসতা। মধ্যরাতে পাক হানাদারবাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে যে ব্যাপক বীভৎস খেলায় মেতেছিল তা নাৎসীবাহিনীর নারকীয়তাকেও হার মানায়।



ডাক্তার মোহাম্মদ আলমগীর

ডাক্তার আলমগীর আমার গ্রামের ছেলে। বর্তমান পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানাধীন লেবুজিল বুনিয়া গ্রামে তার জন্ম। তার পিতার নাম ডাক্তার আব্দুল করিম। গ্রাম্য ডাক্তার। কবিরাজীও করতেন। চিকিৎসক হিসেবে গ্রামে ভালো আয়-রোজগার করতেন। তার প্রথম সন্তান আলমগীর সবেমাত্র রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি, বি. এস. কোর্স সমাপ্ত করেছিল। বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সংগেও জড়িত ছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আলমগীর রাজশাহীতে ছিল। তার একবোনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স-এর ছাত্রী। সঠিক তারিখ জানা যায়নি, তবে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, আল্‌বদর বাহিনী কর্তৃক নিহত হয়েছে। এই সংবাদ বাড়িতে পৌঁছামাত্র তার পিতা ডাক্তার আব্দুল করিম হার্টফেল করে মারা যান। তরুণ যুবক ডাক্তার আলমগীরের আর ডাক্তারী পেশায় যাওয়া সম্ভব হয় নি। অকালে ঝরে গেল একটি অমূল্য জীবন।



২৫ মার্চ ১৯৭১ : কালো রাতে বর্বর বাহিনীর নির্মম শিকার ঢাকার রাজপথের রিকশাওলা ও রিকশার যাত্রী



বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান

মতিউর রহমানের জন্ম ঢাকা শহরে ১৯৪১ সালের ২৯শে অক্টোবর। পৈত্রিক নিবাস রামনগর গ্রামে। তার পিতা আবদুস সামাদ ঢাকা কালেকটরেটের অফিস সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকুরি করতেন। সেই সুবাদে আগা সাদেক রোডের বাড়িতে বসবাস।

মতিউর রহমানের পড়াশুনা শুরু হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে অধ্যয়নের পর চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানকার পাবলিক স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর রিসালপুর পি. এ. এফ. কলেজের পড়াশুনা শেষ করে বৈমানিক (Pilot) হিসেবে কমিশন লাভ করেন ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৫-তে তিনি ছিলেন ফ্লাইং অফিসার। তারপর রিসালপুরে ফ্লাইং ইনস্ট্রাকটর (Instrutor)-এর দায়িত্ব পালন করেন দু'বছর। ১৯৭০ সালে হন জেট ফ্লাইং ইনস্ট্রাকটর (Get Filying Instrutor)। ১৯৭১-এ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম মিলিখান। তার দুই কন্যার নাম যথাক্রমে মাহিন ও তুহিন। তুহিনের জন্ম হয় ১৯৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর।

মতিউর রহমান সপরিবারে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মস্থলে ছিলেন। ১৯৭১-এর জানুয়ারি মাসে সপরিবারে ঢাকায় আসেন। তিনি দু'মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। মার্চ মাসের ২৫ তারিখের রাত্রে দখলদার পাক-বাহিনীর হামলা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। তারপরও তিনি ৬ই মে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে এসে মতিউর রহমানকে এক ভাবনায় পেয়ে বসলো। কী করে একটি বোয়িং বিমান হাইজ্যাক করা যায়, এটাই তার সার্বক্ষণিক চিন্তা। একটি বোয়িং বিমান ছিনতাই করে ভারতে ল্যাণ্ড করতে পারলে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করবেন, এটাই ছিল তার একান্ত ইচ্ছা। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকলেন।

২০শে আগস্ট মতিউর রহমান বিমান ছিনতাইয়ের সুযোগটা পেয়ে গেলেন। ঐদিন সকাল ১১টায় পাইলট অফিসার মিনহাজের আকাশে উড়বার সিডিউল ছিল। বিমানটির নাম ছিল ব্লুবার্ড-১৬৬। মিনহাজ এই বিমানে উড়বার ক্লিয়ারেন্স

পেয়ে গেলেন কনট্রোল টাওয়ার থেকে। তিনি প্রস্তুতি নিলেন। এই সময়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বিমানের কাছে গিয়ে ককপিঠে উঠে যান। তারপর তিনি মিনহাজের সংগে ধ্বস্তাধ্বসি করে চালকের সিট দখল করে নেন। মিনহাজ ছিনতাইয়ের খবর টাওয়ারকে অবশ্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই মতিউর রহমান বিমানটিকে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দু'টি জেট বিমান পিছু ধাওয়া করেও তার হদিস পেল না। দুর্ভাগ্য যে, বিমানটি দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হলো। দুই পাইলটই প্রাণ হারালেন। পাকিস্তান সরকার মতিউর রহমানকে বিশ্বাসঘাতক ঘোষণা করল। তার মৃতদেহ জানাজা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সমাহিত করা হলো।

বাংলার বীর সন্তান মতিউর রহমানের আশা পূর্ণ না হলেও বাংলাদেশ সরকার তাকে বীরত্বের সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' প্রদান করে সম্মানিত করেছে।



১৯৭১ : রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বর্বর বাহিনীর গুলিতে বিদীর্ণ এক তরুণীর লাশ।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

যশোহর জেলার মহেশখালি গ্রামে ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি এক কৃষক পরিবারে নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম হয়। তার পিতার নাম আমানত শেখ। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলে তাকে একটু বেশি আদর করা হতো। তাই কিছুটা দুরন্তপনা ছিল তার। লেখাপড়ায় আগ্রহ ছিল না মোটেই। অপ্রাপ্ত বয়সেই তিনি পিতা-মাতাকে হারিয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে যান। তিনি গান-বাজনা, খেলাধূলায় মত্ত থেকে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন। ওদিকে পিতার রেখে যাওয়া জমিও অনেকটা বিক্রি করে ফেলেন। এ-সময়ে গ্রামের এক অবস্থা সম্পন্ন কৃষকের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন।

যথাসময়ে নূর মোহাম্মদের সন্তান-সন্ততি জন্মালো। তখন তার খেয়াল হলো যে, আর বসে থাকা যায় না। রোজগার করা আবশ্যক। প্রথমে তিনি আনসার বাহিনীতে যোগদান করেন। তারপর ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ই. পি. আর. (বর্তমান বি. ডি. আর.) বাহিনীতে চাকুরি নেন। ১৯৭০ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি দিনাজপুর সেক্টরে কর্মরত ছিলেন। তারপর বদলী হন যশোহর সেক্টরে। এ-সময়ে তার পদবী ছিল ল্যান্স নায়েক।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে নূর মোহাম্মদ শেখও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার দলটি গঠিত হয়েছিল ই. পি. আর-এর বাঙালি সদস্যদের নিয়ে। তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক। গোয়ালহাটি গ্রামে ছিল দলটির অবস্থান। এখান থেকে পাকসেনাদের ঘুটিপুর ঘাঁটির উপর নজরদারী করা ছিল দলটির দায়িত্ব। একসময়ে পাকসেনাদের নজরে পড়ে যায় এ দলটি। ৫ই সেপ্টেম্বর পাক বাহিনী এ-দলটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। আহত হলেন সিপাহী নান্নু মিয়া। আহত সিপাহীকে কাঁধে তুলে নিলেন নূর মোহাম্মদ। তারপর ক্যাম্পের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে চেষ্টা করলেন। এমন সময়ে একটি মর্টারের গোলার আঘাতে তার ডান হাঁটু ভেংগে গেল। নান্নু মিয়াকে তিনি সহযোদ্ধা মোস্তফাকে কাঁধে তুলে নিতে বললেন। মোস্তফা আহত নান্নু মিয়াকে নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তারপর আরো কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এসে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকল। বেগতিক দেখে পাকসেনারা নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে গেল। তারপর খোঁজ করা হলো নূর মোহাম্মদকে। তাকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। তার শরীর বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। তার চোখ দুটি উপড়ে ফেলা হয়েছিল। বোঝা গেল, বর্বর পাক হানাদার বাহিনী তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। এই অসমসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখকে বাংলাদেশ সরকার বীরত্বের সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' প্রদান করে সম্মানিত করেছে।



বীরশ্রেষ্ঠ মুনসী আবদুর রউফ

মুনসী আবদুর রউফের জন্ম ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার সালমতপুর গ্রামে। তার পিতা মুন্‌সী মেহেদী হোসেন ছিলেন মসজিদের ইমাম। তার পরিবার স্বচ্ছল ছিল না। তারপর মুন্‌সী মেহেদী হোসেন মারা গেলেন এক ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে। স্ত্রী মুকিদুন্‌ নেসা তিনটি নাবালক সন্তান নিয়ে খুবই বিপদে পড়লেন।

আবদুর রউফের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি সংসারে অর্থাভাব থাকার কারণে। মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন তিনি। ১৯৬৩ সালে তিনি ই. পি. আর-এ ভর্তি হন। তিনি ল্যান্স নায়েক পদবী পান।

১৯৭১ সালে আবদুর রউফ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ৮ম ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টে সংগে যুক্ত হন। চট্টগ্রাম এলাকা ছিল তার কর্মস্থল। ৮ই এপ্রিল বুড়িঘাটের দিকে এগিয়ে আসছিল পাকসেনারা। গোলাগুলীর শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। আবদুর রউফদের লোকবল ছিল অল্প। অস্ত্র শস্ত্রও খুব বেশি ছিল না। পাক সেনাদের প্রবল আক্রমণে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প বিপর্যস্ত হলো। পরাজয় নিশ্চিত জেনে আবদুর রউফ তার সহযোদ্ধাদেরকে পশ্চাদপসরণ করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বললেন। তাদের পিছু হটাকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তিনি একাই গুলী চালিয়ে যেতে থাকলেন। তার গুলীর আঘাতে পাকসেনাদের স্পীড বোট ডুবে গেল। কতিপয় পাকসেনাও হতাহত হয়। সহসা শত্রুদের মর্টারের একটি গোলা এসে লাগে তার শরীরে। তিনি ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। এ-ভাবে নিজের প্রাণের বিনিময়ে তিনি তার সহযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সরকার তার অসম সাহস, বীরত্ব এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের জন্য তাকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি মরেও অমর হয়ে রইলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে, বাঙালির মনের মনিকোঠায়।

বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

বরিশালের রহিমগঞ্জ গ্রামে আবদুল মোতালেব হাওলাদারের বাড়ি। তার পিতা আবদুর রহিম হাওলাদার একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তারই নামানুসারে এ-গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল। স্বচ্ছল পরিবার। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মোতালেব হাওলাদারের সন্তান। তার জন্ম আনুমানিক ১৯৪৭ সালে। ১৯৬৬ সালে তিনি আই. এস-সি পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন লাভ করেন অফিসার হিসেবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাকোরাম এলাকায় কর্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কথা মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর জানতে পেরে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। আরো কয়েকজন বাঙালি সেনার এরূপ ইচ্ছা ছিল। তারা গোপনে পরামর্শ করলেন। তারপর ৩রা জুলাই শিয়ালকোটের একটি মাযার জিয়ারত করবার নাম করে তারা টেক্সী ভাড়া করে চলে আসেন যথাস্থানে। ওরা চারজন ছিলেন। সবাই ক্যাপটেন পদবীর। রাতের অন্ধকারে তারা নদী সাঁতরিয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করলেন। প্রথমে দিল্লী, তারপর কোলকাতায় আসেন।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পোস্টিং পেলেন মুক্তিযুদ্ধের ৭নং সেকটরে। অন্যান্যরা চলে গেলেন ভিন্ন ভিন্ন সেকটরে। এরা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি ফুলকে বাঁচাতে কিংবা একটি মুখের হাসির জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। এরা চেয়েছিলেন অগণিত ফুলকে বাঁচাতে, অগণিত মুখে হাসি ফোটাতে। তবু এই বাংলায় বর্বর পাক সেনাদের অত্যাচারে ঝরে গিয়েছিল ত্রিশ লাখ তাজা ফুল; হাসি ফুরিয়ে গিয়েছিল কোটি কোটি মুখের।

রাজশাহীর চাঁপাই নবাবগঞ্জ দখলের যুদ্ধ চলছিল পাক হানাদার বাহিনীর সংগে। তখন ডিসেম্বর মাস। ক্যাপটেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর দলসহ ১০ই ডিসেম্বর অবস্থান নিলেন বারঘরিয়া নামক স্থানে। কথা ছিল ভারতীয় মিত্র বাহিনী সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। কিন্তু যে-কারণেই হোক ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। মহিউদ্দিন হতাশ হলেন না। শত্রু হননে তিনি এগিয়ে যান মাত্র জন বিশেক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে। দুর্ভাগ্য, শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গুলী তার মাথায় লাগে। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেদিন ছিল ১৪ই ডিসেম্বর। এইদিন বিকেলে আরো অধিক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এসে শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেল। তারপর নিহত মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের লাশ উদ্ধার করে নিকটবর্তী বিখ্যাত সোনা মসজিদ এলাকায় সমাহিত করা হয়। অসমসাহসিকতা, বীরত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাকে দেশের সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' প্রদান করেছে।



বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন

নোয়াখালি জেলার একটি গ্রামের নাম বাঘচাপড়া। এই গ্রামে ১৯৩৫ সালে রুহুল আমিন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আজহার পাটোয়ারী। তাদের পরিবার আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ছিল না। তাই হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করেই তাকে জীবিকার পথ বেছে নিতে হয়।

১৯৫৩ সালে রুহুল আমিন নৌবাহিনীতে যোগদান করেন জুনিয়র মেকানিক্যাল অফিসার হিসেবে। তারপর পদোন্নতি পেয়ে আর্টিফিসার হয়ে ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম পি. এন. এস. বখতিয়ার নৌঘাঁটিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এপ্রিল মাসে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ২নং সেক্টরের অধীনে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অনেক যুদ্ধে অংশ নেন।

ভারত সরকার বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুটি টাগ বোট দিয়েছিল। এ দুটির নামকরণ করা হয় পদ্মা এবং পলাশ। পলাশ-এর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন রুহুল আমিন। ১০ই ডিসেম্বর নৌ-অভিযানে বেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিনা বাধায় মংলা বন্দরে পৌঁছে যায়। দুপুর বেলায় যখন ভারতীয় মিত্রবাহিনীর গানবোট পাভেল-এর পিছনে পিছনে পলাশ এবং পদ্মা খুলনা শিপ ইয়ার্ডের কাছে পৌঁছে তখন আকাশে তিনটি জংগী বিমান দেখা যায়। শত্রু বাহিনীর বিমান মনে করে পলাশ এবং পদ্মা থেকে গুলী করবার অনুমতি চাইলে মিত্রবাহিনীর ক্যাপটেন মনেন্দ্র নাথ সামন্ত অনুমতি দেন নি। তিনি বলেন, বিমান তিনটি ভারতীয়। কিন্তু হঠাৎ বিমান তিনটি একটু নিচে নেমে এসে পদ্মা ও পলাশের উপরে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ফলে ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। কতিপয় নাবিক হতাহত হয়। এ অভিযানের ভারতীয় অধিনায়ক আদেশ দিলেন জাহাজ ত্যাগ করতে। রুহুল আমিন এ আদেশ মেনে নিতে পারলেন না। তিনি কামানের ক্রুদেরকে বললেন বিমান লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে। যোদ্ধারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময়ে গুলীর আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেন রুহুল আমিন। তিনি নিজের জীবন রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাননি তিনি। এই অসমসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশ সরকার বীরত্বের সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' প্রদান করে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।



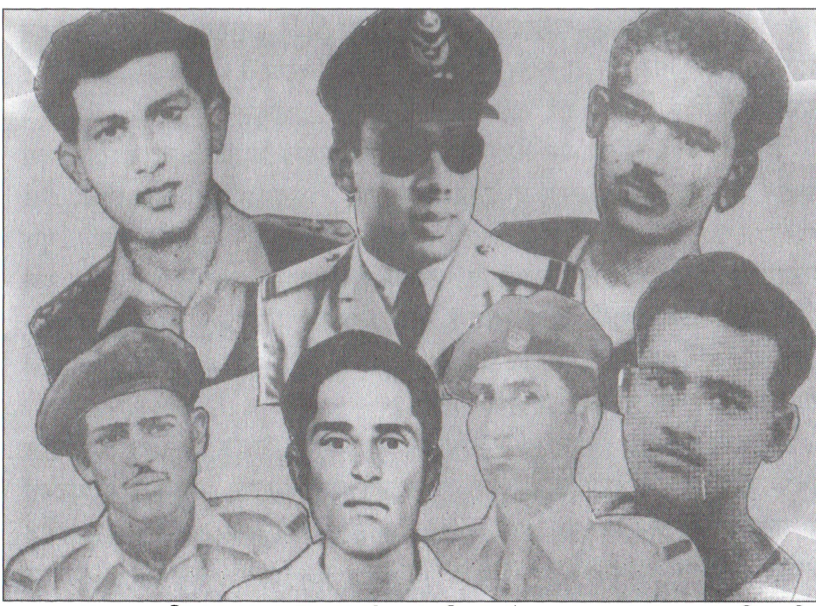
বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল

মোস্তফা কামাল ভোলার হাজীপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাবিবুর রহমান। তিনি সেনাবাহিনীর একজন হাবিলদার ছিলেন। ছেলেবেলায় শুধু দুষ্টুমী করতেন। লেখাপড়া শেখার প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। শৈশবেই তার আশা ছিল, তিনিও পিতার মতো সৈনিক হবেন। বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চাইলে পিতা তাকে নিষেধ করেন। তাই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে ট্রেনিং গ্রহণ করে ১৯৬৮ সালে তিনি চতুর্থ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে চতুর্থ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে মেজর (পরে কর্নেল) শাফায়াত জামিল তার কতিপয় বাঙালি সহকর্মীদের নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘাঁটির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির খান ও অন্যান্য অবাঙালি সেনাদের কৌশলে বন্দী করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণ বাড়িয়াকে ঘিরে তারা একাধিক ঘাঁটি গড়ে তোলেন ১৪ই এপ্রিল পাক বাহিনী ঘাঁটি আক্রমণ করে। তুমুল যুদ্ধ চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে। পাক-সেনাদের প্রবল আক্রমণে অতীষ্ট হয়ে মুক্তি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। পিছিয়ে গিয়ে তারা নতুন করে ঘাঁটি গড়ে তোলেন।

সিপাহী মোস্তফা কামাল ছিলেন দরুইনের ঘাঁটিতে। তিনি সেখানে সেকশন কমাণ্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। তখন পাকবাহিনী চারিদিক দিয়ে ঘেরাও ক'রে রেখেছিল। ঘাঁটিতে খাদ্যাভাব দেখা দিল। বাইরে থেকে খাবার আসার উপায় ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা অনাহারে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মোস্তফা কামাল দরুইন থেকে আখাউড়া দপ্তরে গেলেন খাবারের বন্দোবস্তের জন্য। মেজর শাফায়াত জামিল তাকে ঘাঁটি ছেড়ে আসার জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঘাঁটি প্রধান হয়ে তার পক্ষে ঘাঁটি থেকে চলে আসা উচিত হয় নি। তিনি দরুইনের ঘাঁটিতে ফিরে গেলেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, কোনো অবস্থাতেই আর কখনো ঘাঁটি ছেড়ে কোথায়ও যাবেন না।

১৭ই এপ্রিল পাকসেনারা দরুইন ঘাঁটি আক্রমণ করে। মেজর শাফায়াত জামিল দ্রুত গতিতে আরেক প্লাটুন মুক্তি সেনা পাঠালেন দরুইনে। তুমুল যুদ্ধ হলো। কিন্তু পাক সেনাদের আগ্রাসন ঠেকানো গেল না। তাই পিছু হটে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মোস্তফা কামাল মেশিনগান চালিয়ে যেতে থাকলেন। আর, তার ঘাঁটির সকল মুক্তিসেনা পশ্চাদপসরণ করে আখাউড়া ঘাঁটিতে চলে গেল। দরুইন ঘাঁটি পাক সেনারা দখল করে নিল। পাকসেনারা চলে যাবার পর গ্রামবাসীরা এসে সেখানে দেখতে পায় এক বুলেট বিদ্ধ লাশ। শরীরে বেয়নেট চার্জের ক্ষতও দেখা গিয়েছিল। এভাবেই কর্তব্য পরায়ন এক অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসান ঘটে। বাংলাদেশ সরকার তাকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে।



একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসম সাহসকিতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সাতজনকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ "বীরশ্রেষ্ঠ" খেতাবে ভূষিত করা হয়। এঁরা হচ্ছেন : শহীদ মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ আব্দুর রউফ বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমীন বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ মোস্তফা কামাল বীরশ্রেষ্ঠ ও শহীদ হামিদুর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ।



বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

সিপাহী হামিদুর রহমানের পিতা ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার ডুমুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পরে তিনি চলে আসেন যশোহর জেলার খোরদা খালিশপুরে। তার নাম ছিল আক্কাস আলী মণ্ডল। তিনি ছিলেন দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। হামিদুর রহমান তার প্রথম সন্তান। ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এই সন্তানের জন্ম হয়।

দারিদ্রের কারণে লেখা পড়া বেশি শিখবার সুযোগ হয়নি হামিদুর রহমানের। মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। ১৯৭১ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাকে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে ইস্টবেংগল রেজিমেন্টে। সেখানে ২৫শে মার্চ রাত্রে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর সামিল হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

সিপাহী হামিদুর রহমান ছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের জেড ফোর্সে (তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, পরে মেজর জেনারেল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন)। সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল এলাকায় তিনি যুদ্ধ করেছেন। ২৮শে অক্টোবর দখলদার পাক বাহিনীর সংগে এখানে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। হঠাৎ একটি গুলী এসে লাগল তার মস্তকে। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অধিকৃত হলো ধলই বর্ডার এলাকা। কিন্তু হামিদুর রহমান অকালে চলে গেলেন এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে।

সিপাহী হামিদুর রহমানের সহযোদ্ধারা তার লাশ উদ্ধার করে ধলই সীমান্ত এলাকার এক গ্রামে সমাহিত করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। হামিদুর রহমানের মা-বাবা ভাবছিলেন, এবার তাদের ছেলে বাড়িতে ফিরে আসবে। তারা অধীর আগ্রহে ছেলের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। না, ছেলে আসেনি। এসেছে একখানা চিঠি। চিঠিতে তাদের ছেলের মৃত্যুসংবাদ লেখা ছিল। অসহনীয় মর্মান্তিক খবর। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাকে বীরত্বে সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' প্রদান করে সম্মানিত করেছে। এ সম্মান পেয়েছেন তাকেসহ মোট সাতজন বীর সেনানী যারা অসম সাহসিকতা এবং বীরত্ব দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।



জগন্নাথ হলের নিহত ছাত্রবৃন্দ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে দখলদার বর্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হয়। সেই আক্রমণে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হন কতিপয় বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, ছাত্র এবং কর্মচারী। এখানে জগন্নাথ হলে নিহত কতিপয় ছাত্রের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে। এরা কেউ তখনও বুদ্ধিজীবী হয় নি। তবে তারাইতো ছিল দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সেই সব সম্ভাবনাময় তরুণেরা বেঁচে থাকলে তাদের কেউ কেউ দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারত। কিন্তু বর্বর পাকসেনারা তাদের সেই সুযোগ কেড়ে নিয়েছে নির্মম হস্তে। এখানে যাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তারাই সব নয়। আরও অনেকে ছিল। তথ্য সংগ্রহ করতে না পারার কারণে সকলের নাম তালিকাভুক্ত করা গেল না।

১। উপেন্দ্র নাথ রায়
এম. এস-সি (পদার্থ বিদ্যা) শেষপর্ব
পিতার নাম ঃ মদন মোহন রায়
গ্রাম ঃ গুলিয়ারা, ডাকঘর ঃ সুন্দরপুর, জেলা ঃ দিনাজপুর।

২। কিশোরী মোহন সরকার
এম. এ. (ইংরেজি) প্রথম পর্ব
পিতার নাম ঃ কার্তিক চন্দ্র সরকার
গ্রাম ঃ পাড়াগ্রাম, ডাকঘর ঃ হাটবিজয়নগর, জেলা ঃ ঢাকা।

৩। কার্তিক শীল
এম. এ. (ইংরেজি) শেষ পর্ব
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ কলাখালী, জেলা ঃ বরিশাল।

৪। কেশবচন্দ্র হাওলাদার
এম. এস-সি (গণিত) প্রথম পর্ব
পিতা ঃ কৃষ্ণকান্ত হাওলাদার
গ্রাম+ডাকঘর ঃ কাঁচাবালিয়া, জেলা ঃ বরিশাল।

৫। গণপতি হালদার
বি. এস-সি (রসায়ন-অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
পিতা ঃ নগেন্দ্রনাথ হালদার
গ্রাম ঃ ঘটীচোড়া, ডাকঘর ঃ মঠবাড়িয়া, জেলা ঃ বরিশাল।

৬। জীবন কৃষ্ণ সরকার
এম. এস-সি (রসায়ন) শেষপর্ব
পিতা ঃ যতীন্দ্রমোহন সরকার
গ্রাম ঃ কুলপতাক, ডাকঘর ঃ সেখুপুর, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।

৭। নিরঞ্জন হালদার
এম. এস-সি (পদার্থ) শেষপর্ব
পিতা ঃ যদুনাথ হালদার
গ্রাম ঃ শিকারপুর, ডাকঘর ঃ পিরোজপুর, জেলা ঃ বরিশাল।

৮। বরদাকান্ত তরফদার
বি. এড. (ভূতত্ত্ব—অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
পিতা ঃ তারাকান্ত তরফদার
গ্রাম ঃ খেপামল, ডাকঘর ঃ ফুলবাড়িয়া, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।

৯। বিধান চন্দ্র ঘোষ
বি. এ. (ইংরেজি—অনার্স) তৃতীয় বর্ষ

১০। বিমল চন্দ্র রায়
বি. এ. (পরিসংখ্যান—অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
গ্রাম + ডাকঘর ঃ বালিরটেক, জেলা ঃ ঢাকা।

১১। মৃনাল কান্তি বোস
এম. এ. (অর্থনীতি) শেষ বর্ষ
পিতা ঃ আশুতোষ বোস
গ্রাম ঃ মুরিয়া গোড়া, ডাকঘর ঃ গোহালা, জেলা ঃ ফরিদপুর।

১২। মনোরঞ্জন বিশ্বাস
বি. এস-সি (গণিত—অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
পিতা ঃ নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস
গ্রাম+ডাকঘর ঃ সাতপাড়, জেলা ঃ ফরিদপুর।

১৩। রমনী মোহন ভট্টাচার্য
এম. এ. (দর্শন) প্রথম পর্ব
গ্রাম+ডাকঘর ঃ অষ্টগ্রাম, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।

১৪। রনদা প্রসাদ রায়
বি. এস-সি (গণিত—অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
পিতা ঃ সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়
গ্রাম+ডাকঘর ঃ কস্‌বা, জেলা ঃ ফরিদপুর।

১৫। রাখাল রায়
বি. এস-সি (গণিত—অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
গ্রাম+ডাকঘর ঃ চণ্ডীদ্বার, জেলা ঃ কুমিল্লা।

১৬। শিবকুমার দাস
বি. এস-সি (মৃত্তিকা বিজ্ঞান—অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
পিতা ঃ গণেশচন্দ্র দাস
গ্রাম ঃ পাটুরিয়া, ডাকঘর ঃ আড়কান্দি, জেলা ঃ ফরিদপুর।

১৭। সন্তোষ চন্দ্র রায়
এম. এস-সি (উদ্ভিদবিদ্যা) শেষপর্ব
গ্রাম ঃ বড়িবাড়ী, ডাকঘর ঃ জিনারদি, জেলা ঃ ঢাকা।

১৮। রূপেন্দ্র নাথ সেন
বি. এস-সি (রসায়ন-অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
পিতা ঃ জীতেন্দ্র নাথ সেন
গ্রাম+ডাকঘর ঃ ভাঙ্গা, জেলা ঃ ফরিদপুর।

১৯। শিশুতোষদত্ত চৌধুরী
বি.এ. (ইংরেজি—অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
গ্রাম ঃ আম্বরখানা, ডাকঘর+জেলা ঃ সিলেট।

২০। সত্যরঞ্জন দাস
বি. এস-সি (রসায়ন—অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
পিতা ঃ রাজেন্দ্র কুমার দাস
গ্রাম ঃ বাজনবা, ডাকঘর ঃ চক্রদহ, জেলা ঃ ঢাকা।

২১। সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী
পরিসংখ্যান (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ
পিতা ঃ নলিনী কান্ত চক্রবর্তী
আঠার বাড়ী বিল্ডিং ঢাকা।

২২। সুজিত দত্ত
বি. কম (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
গ্রাম+ডাকঘর ঃ পলাশ, জেলা ঃ ঢাকা।

২৩। সুশীলচন্দ্র দাস
বি. এস-সি (মৃত্তিকা বিজ্ঞান—অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
গ্রাম ঃ বরাইল, ডাকঘর ঃ সলিমগঞ্জ, জেলা ঃ কুমিল্লা।

২৪। স্বপন চৌধুরী
পরিসংখ্যান তৃতীয় বর্ষ
পিতা ঃ হরিরঞ্জন চৌধুরী
গ্রাম+ডাকঘর ঃ ধেমলা, জেলা ঃ চট্টগ্রাম।

২৫। হরিনারায়ণ দাস
বি. এ. (সমাজ বিজ্ঞান—অনার্স) তৃতীয় বর্ষ
গ্রাম+ডাকঘর ঃ নরসিংদী, জেলা ঃ ঢাকা।

২৬। প্রবীর পাল
এম. এস-সি (প্রথম পর্ব)
১২ নং টি. এন. রায় রোড, আমলাপাড়া, ময়মনসিংহ।

২৭। মুরারী মোহন বিশ্বাস
এম. এড্
পিতা ঃ মহাদেব বিশ্বাস
একতারপুর, জানিপুর, কুমিল্লা।

২৮। ননী গোপাল ভৌমিক
পিতা ঃ চন্দ্র মোহন ভৌমিক
গ্রাম+ডাকঘর ঃ শ্যামগ্রাম, জেলা ঃ কুমিল্লা।

২৯। নির্মল কুমার রায়
এম. কম. (প্রথম পর্ব)।

৩০। নিরঞ্জন প্রসাদ সাহা
এম. এস-সি (পদার্থ) প্রথম পর্ব

৩১। প্রদীপ নারায়ণ রায় চৌধুরী
এম. এ. (প্রথম পর্ব)।

* প্রত্যেকের নামের সংগে যে জেলার নাম লেখা হয়েছে, তা সাবেক জেলা—বর্তমানের নয়। সে কারণে কারো কারো জেলার নাম পরিবর্তিত হতে পারে।

রচনাকাল ঃ জুলাই ২০০৮